সবার জন্য ট্রেকিং

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবার জন্য ট্রেকিং

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পৌষালী প্রকাশন

পি-৬ ঠাকুরপুকুর রোড, কলিকাতা-৬৩

SABAR JANYA TREKKING
(Trekking for All)
A Bengali Guide Book for the new trekkers
by
Biswanath Bandyopadhyay

গ্রন্থসত্ব :
সৌরদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৯০

প্রকাশক :
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
পৌষালী প্রকাশন
পি-৬ ঠাকুর পুকুর রোড
কলিকাতা-৬৩

চল যাই পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত

মুদ্রণ :
কাজল প্রিন্টার্স
২৯, গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা-৬

রঙিন আলোকচিত্র—লেখক ও অশোক মুখার্জী
সাদাকালো—জগন্নাথ ভদ্র
মুদ্রণ—প্রভাত বেরা
কল্যাণ বেরা

প্রচ্ছদ :
পরিকল্পনা—রঞ্জন পুরকায়স্থ
রূপায়ণ—নৃপেন নাথ

মূল্য : ~~২৪·০০~~ 30.00

নতুন প্রজন্মের পর্বত-পদযাত্রীদের উদ্দেশ্যে

অজানার প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই কারণে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য আর রহস্যের টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ভিড় জমে হিমালয়ের সেট-প্যাটার্নের ট্রেকিং রুটগুলিতেও। খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রকৃতি ও পর্বত-প্রেমী এই সব মানুষদের পর্বতারোহণ দূরে থাকুক, অনেকের হয়তো পাহাড় সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। শুধু বুকের মধ্যে হিমালয়ের প্রতি এক বিরাট ভালবাসা সম্বল করে বেরিয়ে পড়েন।

অভিযানের কাছাকাছি অথচ অভিযান নয়, কিছুটা ঝুঁকি আর রোমাঞ্চ এ নিয়েই ট্রেকিং। এখানে প্রাপ্তি এত বেশি যে এর আকর্ষণ থেকে দূরে থাকা মুশকিল। ট্রেকিং-এ যে ঝুঁকির ব্যাপার আছে তা নিয়ে সাবধানী মানুষরা মাঝে মধ্যেই হৈ-হৈ রব তোলেন। কাগজে লেখা লেখি হয়, বলেন বন্ধ করে দাও এসব। তা, পাহাড়ে যাওয়া এসবে বন্ধ হয়নি, হবেও না। মানুষ পাহাড়ে যাবেই। অন্তত যতদিন এই দেশে হিমালয় আছে। আর ঝুঁকি আছে বলেই বর্ত্তমান তরুন প্রজন্মের মধ্যে পর্বতারোহণ, ট্রেকিং প্রভৃতি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

তবে একবারে কিছু না জেনে পাহাড়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। আবার হুট বলতেই পর্বতারোহণের ট্রেনিং নেওয়াও সম্ভব নয়। তাই যাঁরা প্রথম পাহাড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা ভেবেই "সবার জন্য ট্রেকিং"। যদি কেউ বইটিকে প্রচণ্ডভাবে টেক্‌নিক্যাল ভেবে বসেন তবে ভুল করবেন। বইটি সেভাবে লেখা হয়নি। সহজ সরল ভাবে ট্রেকিং সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে মাত্র।

কিছু ক্ষেত্রে বিষয়ের পুনরাবৃত্তির মতো যে ব্যাপার চোখে পড়বে তা কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদেই এসেছে। কারণ বিষয়টিই এই রকম। কতটা সফল হওয়া গেছে জানা নেই। বইটি পড়ে যাঁরা পাহাড়ে যাবেন, ফিরে এসে তাঁরাই বলতে পারবেন।

বইটি খুব ছোট আকারে করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। এমন কি একটি মাত্র খণ্ডেও সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। আসলে বিষয়টি এত বিরাট, যে একে বোধ হয় কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। যাঁরা পাহাড়ে যান তাঁরা সকলেই জানেন প্রতিবছরই পাহাড় থেকে ফেরার সময় তাঁরা কিছু শিখে আসেন।

"সবার জন্য ট্রেকিং" রচনার সময় সুভাষ রায়, গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ ভট্টাচার্য, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ কর্মকার, বিনয় আচার্য, ভূপেন ভট্টাচার্য ছাড়াও অসংখ্য পর্বতপ্রেমী বন্ধু সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিমালয়ে পদযাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছরেই বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই সহজ ভাষায় লেখা "সবার জন্য ট্রেকিং"য়ের মত একটি বইয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। বেরিয়ে পড়ার আগে প্রতিটি পদযাত্রীই বইটি একবার দেখে নিতে পারেন—কাজে লাগবে। খুটিনাটি কোন কিছুই বাদ যায় নি, ম্যাপ, সাজসরঞ্জাম এমনকি ওষুধপত্র পর্যন্ত সব বিষয়েই আলোচনা হয়েছে।

কোন প্রস্তুতি ছাড়া পাহাড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বিশদ বলার বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই। কারণ পাহাড় কখনও অসাবধানতাকে ক্ষমা করে না।

মোটামুটি ভাবে পাহাড়ে ট্রেকিং নিয়ে লেখা হলেও সাধারণ ট্রেকাররাও এর থেকে অনেক কিছু গ্রহণযোগ্য খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে এ জন্যই আমার মনে হয়, স্কুলের ছাত্রদের প্রাইজ দেবার সময় এ বইটির কথা ভেবে দেখা উচিত।

৬৩ই মহানির্বাণ রোড
কলিকাতা-২৯

কমল কুমার গুহ
২২।৫।৯০

●

বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। পরিচয় ঘটেছিল ''চল যাই'' পত্রিকার মাধ্যমে। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। তবে এই পরিণতি বিশ্বনাথবাবুর নিজ গুণেই সম্ভব হয়েছে। কত কম সময়ের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তা বিশ্বনাথবাবুর সংস্পর্শে না এলে ঠিক বোঝা যাবে না।

এদেশে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় একটি পত্রিকা চালানো যে কত কঠিন সে অভিজ্ঞতা, খুব সামান্যভাবে হলেও, আমার আছে। ''চল যাই'' পত্রিকার উন্নতিকল্পে এবং তার প্রচারের প্রয়াসে তাঁর যে অপরিমেয় আগ্রহ এবং অনন্ত পরিশ্রম রয়েছে তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই একনিষ্ঠা একদিন নিশ্চয়ই সার্থক হবে।

এ কথা এতদিন জানতে পারিনি যে এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি একটি পুস্তক রচনায় রত ছিলেন গত দু'বছর ধরে। সে পুস্তক পদব্রজে হিমালয় পরিক্রমা করার কলাকৌশল সম্পর্কে। বাংলা ভাষায় পর্বতারোহণের (পদযাত্রা পর্বতারোহণেরই একটি অঙ্গ) উপর পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। যে দু'চারখানা রয়েছে সেগুলি প্রধানত শৈলারোহণের উপরে। কিন্তু 'সবার জন্য ট্রেকিং' পর্বতারোহণের, বিশেষ করে পদযাত্রার, বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোকপাত

করেছে। শুধু পদযাত্রীদের নয়, ক্যাম্পারদের পক্ষেও এই পুস্তকটি বিশেষ উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস। যদিও বলা হয়েছে যে যারা প্রথম হিমালয়ে পদযাত্রা প্রয়াসী, তাদের জন্যই এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে—কিন্তু পর্বতারোহণের অনেক বিষয়ও এতে সংযোজিত হয়েছে। আসলে পদযাত্রা কোথায় শেষ এবং পর্বতারোহণ কোথায় শুরু তার সঠিক সীমা নির্দ্ধারণ করা খুব সহজ নয়—বিশেষ করে হিমালয়ের ক্ষেত্রে। কারণ যে কোন পর্বতারোহণ অভিযানেই দীর্ঘ পদযাত্রার প্রয়োজন হয় মূল শিবিরে পৌঁছতে গেলে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূল শিবিরে পৌঁছতে গেলে পর্বতারোহণের কলা কৌশল কিছু কিছু ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিপথগুলি অতিক্রম করতে গেলে অনেক সময়েই পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। হয়তো সেই জন্যই এই পুস্তকে পর্বতারোহণ সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

এ ধরনের পুস্তকে যা যা বিষয় থাকার কথা তা প্রায় সবই আছে, তবে 'Wood craft' এবং 'পাহাড়ে আচরণ বিধি' পরিচ্ছেদ দু'টি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পাহাড়ে আমরা যাই, কিন্তু অনেক সময়েই পাহাড়ের আচরণবিধি মেনে চলি না। সেইজন্য এ কথাগুলি বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। পাহাড় পর্বতে বন জঙ্গলে চলতে গেলে 'Wood craft' পদযাত্রী এবং ক্যাম্পারদের পক্ষে একটি অত্যন্ত জরুরী শিক্ষনীয় বিষয়।

একজন মানুষকে পদযাত্রার-উদ্যোগ করতে গেলে কী ধরণের প্রস্তুতি নিতে হবে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত। যাঁরা অভিজ্ঞ পদযাত্রী তাঁরাও এই পুস্তকটি থেকে অনেক নতুন তথ্য পাবেন।

'সবার জন্য ট্রেকিং' পড়লেই বোঝা যায় যে লেখক এই পুস্তকটি রচনার পূর্বে এ সম্পর্কে প্রচুর ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। অসংখ্য উদাহরণদায়ক চিত্র বইটির মান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিষয়টি বিশাল। তার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা একটি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে সম্ভব নয়। আমরা আনন্দিত যে এর দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশোন্মুখ। আমরা গভীর আগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছি।

আমি আশা করি, এই পুস্তকটি পর্বতপ্রেমীদের মধ্যে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

অশ্রুময় গুহঠাকুরতা
১৬ই মে, ১৯৯০

হাজার খেলার রাজা খেলা
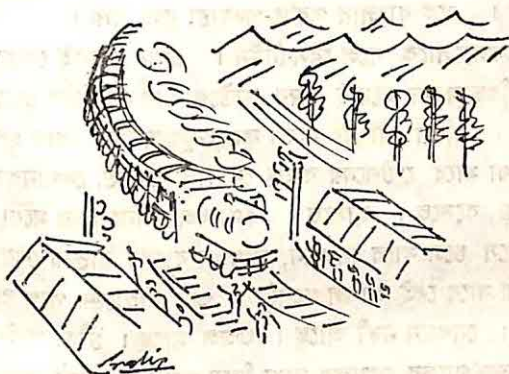
একটু গরম পড়তে শুরু করলেই হল, আর ঠিক তক্ষুণি সেই দারুণ ব্যাপারটা শুরু হয়ে যায়।

তখন কাকডাকা ভোর। শিলিগুড়ি, রক্সৌল, হলদোয়ানি, কালকা, হরিদ্বার বা দেরাদুনের মতো কোনও শহরের রেলওয়ে স্টেশনে ওরা টুক টুক করে নেমে পড়ে। হয়তো ভোরের আলো তখনও তেমন করে ফোটেনি। আবছা আলোয় চোখে পড়ে দূরের হিমালয়। সে দিকে এক ঝলক তাকিয়ে খুশি আর উছলে পড়া আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে সবাই। কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর আনন্দে কলবল করতে করতে পিঠের ওপর তুলে নেয় নিজেদের রুকস্যাক-গুলো। রঙ বাহারী রুকস্যাক। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী, গোলাপী, কত বিচিত্র রঙ তাদের। ওদের দেখে তখন মনে হয় একদল রঙিন পাখী। সাধারণ যাত্রীরা কৌতূহলের সঙ্গে ওদের দিকে তাকায়। ভাল লাগে। কিন্তু ওরা কারা ?

হিমালয় আদি যুগ থেকেই দেবতার স্থান নিয়ে আছে ভারতের মানুষের মনে। যত বিখ্যাত তীর্থস্থান সবই হিমালয়ে। প্রাচীনকাল থেকে মুনি ঋষিরা হিমালয়কে বেছে নিয়েছিলেন তপস্যার স্থান হিসেবে। হিমালয়ের অর্থ এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে, মহেশ্বর—শিব। তাছাড়া পুরানো দিনের

মানুষ হিমালয়ের বিখ্যাত সব গিরিপথ দিয়ে তিব্বত, চীন, মাঙ্গোলিয়া, রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করতেও যেত। ওই সব পথেই এককালে ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান এক দেশ থেকে অন্য দেশে আদান প্রদান হয়েছে। তা এরা কিন্তু সবাই তীর্থযাত্রী, সাধু বা ব্যবসাদার নয়। পিঠে ওই মালের বোঝা বাণিজ্যের পসরা নয়। আর সে সব দিনও চলে গেছে।

ওই সমস্ত রুকস্যাক ওয়ালারা নৃ-তত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী, ভূ-তত্ত্ববিদ বা ভূগোল-বিশারদ হতে পারে। এমন লোক ওদের মধ্যে থাকাটা বিচিত্র নয়। তবে এক্ষেত্রে সবাই ট্রেকার। হিমালয়ে ট্রেকিং-এ এসেছে সবাই। ট্রেকিং কথাটার মানে সোজা। অর্থাৎ আনন্দ আর মজা করতে করতে পাহাড়ে পর্বতে পায়ে হেঁটে ঘোরা। একে বাংলায় পর্বত-পদযাত্রা বলা যায়।

ট্রেকাররা এই সব শহরগুলোকে বলে বেস-টাউন। এখান থেকেই যেহেতু ওদের যাত্রা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাউকে আর স্টেশনের চত্তরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রঙিন পাখীর মতো ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উধাও হয়ে যাবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে স্টেশনের কাছে যে বাস স্ট্যান্ড, সেখানকার কোনও একটা বাসে চড়ে বসেছে। হাসছে। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। এমনি করে ওরা বাসে বাসে চলে যাবে সেখানে, যেখানে বাসের রাস্তার শেষ। আর তার পরেই শুরু হয়ে যাবে সেই আসল মজাটা। ওরা পাহাড়ের পথে দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করবে। সেখানে নদী আছে। জঙ্গল আছে। চীড়, পাইন, দেওদার, রডোডেনড্রন, ভূর্জগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। পায়ের তলায় শুকনো ঝরা পাতার রাশ। পথের পাশেই উচ্ছল পাহাড়ী মেয়ের মতো উপল বিছানো পথে ছুটে চলেছে পাহাড়ী নদী। সে নদীর নামও হয়তো বিচিত্র। অজস্র রঙিন পাথর আর বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে সে নদীর জল ছিটকে ওঠে যখন তখন। কখনও পথের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঝর্ণা। ওরা সন্তর্পণে পার হয়। তার পরেই হয়তো অজানা এক পাহাড়ী গ্রাম। সহজ সরল পাহাড়ের মানুষ। শহর আর কোলাহল থেকে অনেক দূরে পাহাড়ী সেই গ্রামের মায়া তাদের মনে গেঁথে যায়। হয়তো সেটাই ওপথের শেষ গ্রাম। খাড়াই পথ চলার শ্রমের ফাঁকে ফাঁকে তাদের মন ভুলিয়ে দেয় কোনও বরফে ঢাকা পাহাড় চূড়ার দৃশ্য। অথবা ফুলে ঢাকা বুগিয়াল। গভীর গর্জের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদীর গম গমে শব্দ।

পথ চলতে চলতে ওরা গান গায়। রাতের বেলা টেন্টের সামনে বসে দূরের বরফে ঢাকা চূড়ার দিকে তাকিয়ে গল্প করে। মাথার ওপর অসম্ভব নীল আকাশ। চাঁদ কথা কয় এই সময়। তখন ওদের শুধু বুক নয় সব কিছুর মধ্যেই হিমালয়।

এমনি করেই ওরা একদিন পায়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাবে একবারে স্নো-

লাইনের কাছে। কখনও বা তারও কিছুটা ওপরে। সেখানে একদম ঢিল ছোড়া দূরত্বে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুধের মতো সাদা বরফে ঢাকা পাহাড় চূড়া। পাশেই হয়তো হো-হো করে নেমে এসেছে বিরাট এক গ্লেসিয়ার। চোখের সামনে গুম গুম করে নেমে আসছে অ্যাভেলান্স। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ছুটে চলেছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। হাতের কাছেই গ্লেসিয়ারের স্নাউট। সেখানে জন্ম নিয়েছে ভাগীরথী, পিণ্ডার, যমুনা, অলকানন্দার মতো পৃথিবী বিখ্যাত সব নদীরা।

বিশ্বকাপ ফুটবল বা ক্রিকেট যে মাঠে হয় তার খোঁজ আমরা অনেকেই রাখি। কিন্তু বিশ্বমানের পর্বতারোহণের জায়গা যে হিমালয়, এ খোঁজ আমরা অনেকেই হয়তো রাখি না। পর্বতারোহণের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষ হিমালয়ের খোঁজ রাখে। আর প্রতিবছর হিমালয়েই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পর্বতারোহণ হয়ে থাকে। যাতে অংশগ্রহণ করেন পৃথিবী বিখ্যাত পর্বতারোহীরা। পাহাড় ভালবাসে অথচ পর্বতারোহী নয় এমন লোকও তো আছে। সেইসব মানুষরাও তাই প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে হাজারে হাজারে হিমালয়ে আসে। পর্বতারোহণ আর ট্রেকিং-এর আদর্শ জায়গা হিমালয়। পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও ধরণের ট্রেকার তার মনের মতো জায়গা আর পরিবেশ খুঁজে পাবে হিমালয়ে।

পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ঘোরা আসলে এমন কিছুই হাতী ঘোড়া ব্যাপার নয়। একটি শিশুর যেমন হাঁটতে শিখতে বছর দু-তিন সময় লাগে, তেমনি এইটুকু সময় আর গাইডেন্স পেলেই যে কোনও সুস্থ আর স্বাভাবিক মানুষ একজন ভাল ট্রেকার হয়ে যেতে পারে। তাই কচি-কাঁচা, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-গুঁড়ো সবার জন্য ট্রেকিং। হাজার খেলার রাজা খেলা, মজার খেলা ট্রেকিং। এ খেলা সবাই খেলতে পারে। বাছ বিচার নেই। গিরিরাজ হিমালয় তার অন্তহীন বৈচিত্র্য আর অফুরন্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্য ভাণ্ডার নিয়ে এই খেলাটা খেলবে বলে সবার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে। শুধু যাওয়ার অপেক্ষা।

মাউণ্টেনিয়ারিং বা পর্বতারোহণ আজ সারা বিশ্বে একটি স্বীকৃত স্পোর্টস। জনপ্রিয়তার অন্ত নেই এই খেলার। যত দিন যাচ্ছে পৃথিবীর যুব সমাজ এই খেলায় ততই আগ্রহী হচ্ছে। পর্বতারোহণের প্রথম পদক্ষেপ ট্রেকিং। যে যত ভাল ট্রেকার সে তত ভাল মাউণ্টেনিয়ার বা পর্বতারোহী। তবে যে কোনও পর্বতারোহীকে শেষ জীবনে ট্রেকিং নিয়েই থাকতে হয়। পর্বতারোহণ ক্রিকেট খেলার মতো। যতদিন শরীরের সামর্থ, যতদিন ফর্ম, ততদিনই টেস্ট খেলা।

পর্বতারোহণ এবং ট্রেকিং দুটোই পরিশ্রমসাধ্য ঘাম ঝরাণো কাজ। শুধু মাত্র শরীরের সামর্থই বড় কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দরকার প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি।

বিশেষ করে ক্লাইম্বিং বা পর্বতারোহণে। পর্বতারোহণের সময় মানুষ নিজেকে গালাগাল দেয়। আর দেবে না-ই বা কেন। পর্বতারোহণ মানেই তো অসম্ভব পরিশ্রম, বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতা, পিঠের ওপর বোঝা, নিশ্বাসের কষ্ট, চোখ ঝলসানো সূর্যের আলো, ভিজে জামাকাপড়, ভিজে জুতো, মাথার যন্ত্রণা, বাঁধা সময়ের মধ্যে বিশেষ জায়গায় পেঁছানোর ব্যাপারে উদ্বেগ, শক্ত বরফের ধাপ কাটার পরিশ্রম, এর সঙ্গে পা-পিছলানো বা পড়ে যাবার ভয় তো সব সময় আছেই। তাছাড়াও খারাপ আবহাওয়া, তুষার ঝড়, বজ্রপাত, অ্যাভেলান্স, ভিজে স্লিপিং ব্যাগে ঘুম হীন রাত, হাত-পা না ছড়াতে পারার মতো ছোট টেণ্ট, এই সব বিশ্রী ব্যাপারগুলো পর্বতারোহণের নিত্য সঙ্গী।

তবুও দেখা যায় সেই লোকটাই আবার পরের বছরে পাহাড়ে ছুটছে। কেন যায়? সে কি শুধু মানুষের রক্তের মধ্যে মিশে থাকা এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়? বোধহয় নয়! হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য। বরফগলা জলের নীল নদীর কলতান। কাকচক্ষু লেকের জলে পাহাড়ের ছায়া। নয়ন ভুলানো সূর্যোদয়। সূর্যাস্ত। এসব মিলিয়ে বোধ হয় পাগল হয়ে যায় ওরা। শহরের ব্যস্ত কর্মময় জীবনে দিনরাত পাহাড় ওদের ডাকে। কেন যাও? এ প্রশ্নের উত্তর ওরা সঠিক ভাবে দিতেও পারে না। শুধু আধখানা কথা বলে দায় সারে। সে কথাও আবার ম্যালোরী সাহেবের দার্শনিক কথা। কার সাধ্য সে কথা বোঝে। সত্যিই তো কী মানে বোঝা যায়, যদি কেউ বলে "ওটা আছে তাই।" কী আছে? তা বুঝতে গেলে পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রকৃতিকে জয় করার ইচ্ছে মানুষের মজ্জাগত। সেই নিরিখে লোকে যশের জন্য, জীবিকা, অর্থ, সম্মান, অভিযান বা বিশেষ জায়গাটাতে যাওয়া হয়নি বলেই পাহাড়ে যায়। এ ছাড়াও শৃঙ্গ বিজয় বলে একটা কথা আছে। পর্বতারোহী শৃঙ্গ বিজয়ে যায়। হয়তো সে পাহাড়ের সেই বিশেষ শৃঙ্গের মাথায় পা-ও রেখে আসে। কিন্তু যখন ফিরে আসে তখন অন্য কথা বলে। ওরা সকলেই বলে পাহাড় নয়, তারা নাকি নিজেদেরই জয় করে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ জয়টা নিজের বিরুদ্ধে। পাহাড়ের বিরুদ্ধে নয়। এও এক ধন্দ। ওরা বলে, আসলে জয়ের পরেও পাহাড় তেমনিই থাকে। অবিচল, উন্নত। সেই পাহাড় চূড়ায় হিমালয়ের দয়া না হলে কেউ নাকি পা রাখতে পারে না। সেখানেই পরীক্ষা হয়ে যায় একটা মানুষের সীমাবদ্ধতা, ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা, অসহায়তার। এই সত্যটাই তখন এক মাত্র সত্য হয়ে যায়। এর বাইরে কিছু নেই। ওখানে তো অন্য কেউ নেই শুধুমাত্র হিমালয়। বিচিত্র সেই পরিস্থিতিতে বাহবা দেবার বা সাহায্য করার কেউ নেই। প্রতিপক্ষ হিমালয়। যার সামান্য ইচ্ছাতেই একটা অ্যাভেলান্স বা তুষার ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে যে কোনও পর্বতারোহী। তাই যে কোনও পর্বতাভিযানের পরেই মানুষের আত্মাম্ভরীতা বলে বস্তুটা

চলে যেতে বাধ্য। হিমালয় মানুষকে দীন, হীন নগ্ন করে ছেড়ে দেয়। মানুষ উপলব্ধি করতে পারে নিজের ক্ষুদ্রতাকে। বদলে যায় মানুষ। কিন্তু সে পায়ও অনেক কিছু। নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, মনের শক্তি, এক সঙ্গে কাজ করার প্রবণতা, সহমর্মীতা, সাহস, ধৈর্য, আর ধীর স্থির চিত্তে জীবনের যে কোনও সমস্যা মোকাবিলার শক্তি। এই প্রাপ্তি ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রেও প্রায় এক। পর্বতারোহণ খেলাধুলা। পৃথিবীতে এমন আর কোনও খেলাধুলাই নেই যা মানুষকে এত কিছু দিতে পারে। পর্বতারোহণ বা ট্রেকিং-এ ঝুঁকি অবশ্যই আছে। তবে এখন অনেক উন্নত সরঞ্জাম আর পর্বতারোহণের টেকনিক আবিস্কারের ফলে ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। পর্বতারোহী ছাড়া ট্রেকারদেরও সে সব জানতে হবে।
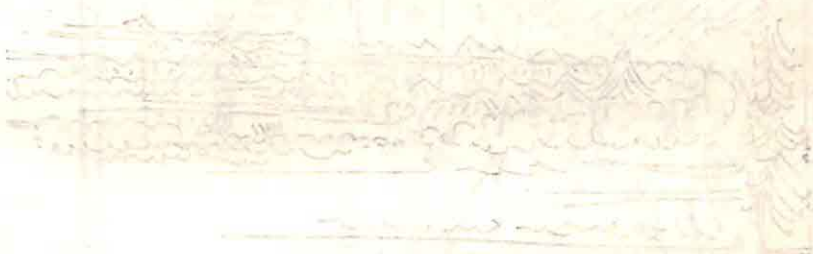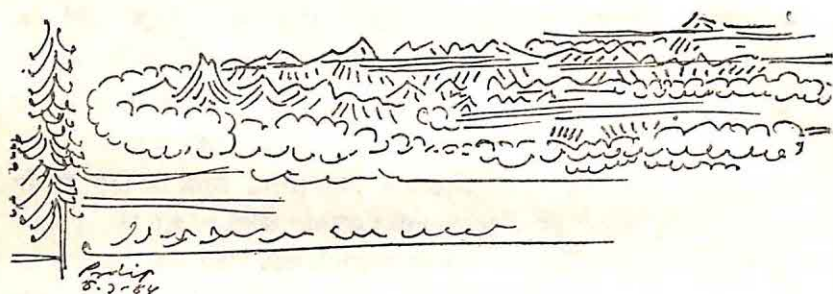
হিমালয়

হিমালয় সম্পর্কে সাধারণ স্কুল কলেজের পাঠ্য বইগুলিতে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি। তবুও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা হয়তো খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের দেশের হিমালয়ের বর্তমানে ভূপৃষ্ঠের যেখানে অবস্থিতি সেখানে বহু যুগ আগে টেথিস নামে একটি অগভীর ও অপ্রশস্থ সমুদ্র ছিল। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কঠিন শিলায় গঠিত দুটি ভূখণ্ড ছিল। উত্তরের ভূখণ্ডটিকে লরেন্সীয় আর দক্ষিণটিকে গণ্ডোয়ানা বলা হতো। এই দুই ভূখণ্ড থেকে যুগ যুগ ধরে ক্ষয় করে বয়ে নিয়ে আসা শিলা ঐ সমুদ্রটিকে প্রায় ভরাট করে ফেলেছিল। উপরোক্ত কঠিন ভূত্বকের তলায় অপেক্ষাকৃত তরল শিলাস্তর আছে। উপরের শিলাস্তর এই তরল শিলাস্তরের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং নানা প্রাকৃতিক কারণে ভাসমান ভূখণ্ড খুব ধীরে ধীরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ক্রমশ সরে যেতে থাকে। সেই রকম প্রাকৃতিক কারণে গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ড উত্তর দিকে সরে গিয়েছিল। এবং ঐ টেথিস সাগরে সঞ্চিত শিলা সমুদ্রকে চাপ দিয়ে লরেন্সীয় ভূখণ্ডের উপর ঢেউ-এর আকারে ভাঁজ খাইয়ে ফেলেছিল। এ থেকেই ঢেউ খেলানো হিমালয় ভঙ্গিল

পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চতার জন্যে হিমালয়ের চূড়াগুলি সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। সেই কারণেই এই পর্বতমালার নাম হিমালয়। এটি পৃথিবীর
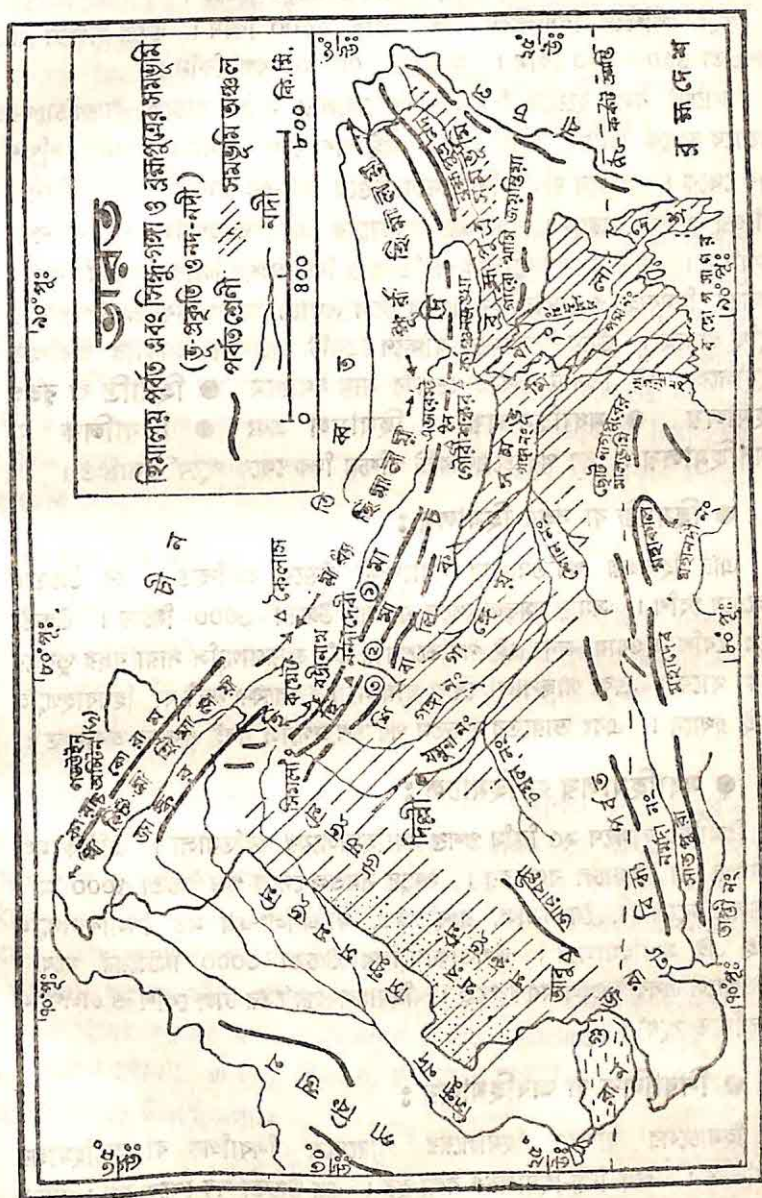
সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ পর্বতমালা। ভারতের পূর্বপ্রান্তে আসাম সীমান্তে

হিমালয়ের পূর্বাংশের নাম হয়েছে পূর্বাঞ্চল। হিমালয়ের পশ্চিমে রয়েছে কারাকোরাম বা কৃষ্ণগিরি পর্বত এবং জাস্কর পর্বত। ভারতের উত্তরে পামীর গ্রন্থী থেকে এই সব পর্বতশ্রেণী পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়েছে।

পূর্ব পশ্চিমে হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ কিমি। উত্তর দক্ষিণে এর প্রশস্ততা ১৫০—৪০০ কিমি। আয়তন ৫,০০,০০০ বর্গ কিমি।

আগেই বলা হয়েছে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে পাশ্বর্চাপের প্রভাবে ভূত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে। এই পাশ্বর্চাপ এসেছিল প্রধানত দক্ষিণ দিক থেকে। এখানে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে ঢেউ-এর আকারে পর পর তিনটি ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। ঢেউ-এর আকারের এই ভাঁজগুলি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। এর উঁচু অংশগুলিকে পর্বত আর নিচু অংশগুলিকে উপত্যকা বলে। এছাড়া হিমবাহ ও নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে এখানে অনেক ব্যবচ্ছিন্ন উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে তিনটি ঢেউ এর আকারে অবস্থিত হিমালয়ের এই তিনটি পর্বত শ্রেণীর নাম যথাক্রমে ● **হিমাদ্রি** বা **বৃহৎ হিমালয়** ● **মধ্যহিমালয়** বা **হিমাচল** এবং ● **শিবালিক** বা **অবহিমালয়**। সব পর্বতশ্রেণীকটি পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে প্রসারিত।

● হিমাদ্রি বা বৃহৎ হিমালয় :

এটি হিমালয় পর্বতমালার সর্বাপেক্ষা উত্তরে অবস্থিত। এর উচ্চতাই সবচেয়ে বেশি। সমুদ্র সমতল থেকে এর গড় উচ্চতা ৬০০০ মিটার। উচ্চতা খুব বেশি হওয়ার জন্য এই পর্বতশ্রেণীর উঁচু জায়গাগুলি সারা বছর তুষারে ঢাকা থাকে। এবং গাছপালা দেখা যায় না। বরফের নদী বা হিমবাহগুলি সবই এখানে। এবং ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলি সবই এখানে অবস্থিত।

● মধ্যহিমালয় বা হিমাচল :

হিমাদ্রির দক্ষিণে ২৫ কিমি প্রশস্ত মধ্যহিমালয়ের পর্বতমালা। এটিকে মধ্য হিমালয় বা হিমাচল বলা হয়। সমুদ্র সমতল থেকে গড় উচ্চতা ৫০০০ মিঃ। সিমলা, মুসৌরী, নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, দার্জিলিং-এর মত শৈলাবাসগুলি সবই এই মধ্যহিমালয়ে। উপত্যকাগুলির উচ্চতা ৩০০০ মিটারের মধ্যে। শীতকালে এসব অঞ্চলে বরফ পড়ে। হিমাচল পর্বতের ঢাল বেশি ও ঢালগুলি বনভূমিতে পূর্ণ।

● শিবালিক বা অবহিমালয় :

হিমাচলের দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশে শিবালিক বা অবহিমালয় অবস্থিত। একে নিম্ন-হিমালয়ও বলা হয়। এর উচ্চতা সব থেকে কম। সমুদ্র সমতল থেকে ৬০০ মিটারের মতো। ১০ থেকে ৫০ কিমি প্রশস্ত এই পর্বত

শ্রেণীটি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন। এই অঞ্চলে অনেকগুলি পার্বত্য উপত্যকা আছে। এগুলি সবই বসতিপূর্ণ। এগুলি দুন নামে পরিচিত। দেরাদুন বা মারে উপত্যকা বিখ্যাত। গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে সমগ্র হিমালয়ের ঢাল খুব খাড়া ভাবে উঠে গেছে।

সমস্ত হিমালয়কে আবার পূর্ব পশ্চিমে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

● পশ্চিম হিমালয় ● মধ্য হিমালয় ● পূর্ব হিমালয়।

● পশ্চিম হিমালয় ঃ

এই অংশটি পশ্চিমে কাশ্মীর রাজ্য থেকে পূর্বে নেপালের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশেই হিমালয়ের প্রস্থ সবচেয়ে বেশি—প্রায় ৫০০ কিমি এবং এই অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশি তুষার ও হিমবাহ দেখা যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর হ্রদ ও বিচিত্র ধরনের গাছপালার এখানে দেখা মেলে। লাডাক, জাস্কর, পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী নিয়ে পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর হিমালয়। এখানকার কাশ্মীর উপত্যকা এবং কাংড়া উপত্যকাতে হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। চাম্বা, কুলু, মানালী এসব উপত্যকার শোভা অতুলনীয়।

● মধ্য হিমালয় ঃ

মধ্য হিমালয়ের বেশির ভাগ অংশ প্রধানত নেপালের অন্তর্গত। নেপাল ছাড়া ভারতের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার নাথ, পিন্ডারী প্রভৃতি হিমবাহ এই মধ্য হিমালয়ে। উত্তর প্রদেশের কুমায়ুঁ অঞ্চলের উপত্যকাগুলি সুন্দর।

● পূর্ব হিমালয় ঃ

নেপালের পূর্বদিক থেকে প্রসারিত হিমালয়ের অবশিষ্ট অংশে পূর্ব-হিমালয়। পূর্বহিমালয় কিছুটা পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে দক্ষিণে বেঁকে গেছে। এখানে পর্বতের ঢালে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ায় ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের একবারে পূর্ব সীমান্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়েছে। একে পূর্বাচল পর্বতমালা বলে।

পূর্বাচল পর্বতশ্রেণীতে নাগভূমির পাটকই পর্বত। নাগা ও কোহিমা পাহাড় মণিপুরের বরাইল পর্বত ও তুয়েনসাং পাহাড়, মিজোরামের লুসাই ও মিজো পাহাড় প্রধান। এ ছাড়া শিলং বা মেঘালয়ের মালভূমির গারো, খাসি, ও জয়ন্তির পাহাড় উল্লেখযোগ্য।

ট্রেকিং ট্রেকিং

হিমালয়ে যে ধরণের ট্রেকিং হয় তাকে প্রাথমিকভাবে দু ভাগে ভাগ করা যায়। ● **লো অলটিচিউড** বা **নিম্ন উচ্চতায় ট্রেকিং** এবং ● **হাই অলটিচিউড** বা **অতি উচ্চতায় ট্রেকিং**। উভয়ের মধ্যেই সেট-প্যাটার্ন অর্থাৎ পরিচিত এবং অপরিচিত রুট থাকতে পারে।

● **লো অলটিচিউড** বা **নিম্ন উচ্চতায় ট্রেকিং** ঃ

হিমালয়ের চির তুষার অঞ্চলের নিচে, অর্থাৎ যাকে স্নো-লাইন বলে তার নিচের অংশে ট্রেকিং। এখানে ট্রেকারদের খুব উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল বা পাসগুলো পার হতে হয় না। ফলে সেই ধরণের বিশেষ সরঞ্জাম বা পর্বতারোহণের বিশেষ কৌশল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই সব ট্রেকিং সাধারণত ৪৫০০ মিটারের নিম্ন অঞ্চলগুলিতেই হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত দলের টেন্ট আছে সেগুলি নিয়ে গেলে সেখানে রাত্রিবাস সম্ভব। না হলে গ্রামীন স্কুল, পঞ্চায়েতের বাড়ি, সরকারী রেস্ট হাউস ইত্যাদিতে রাতে থাকা যেতে পারে। এই ধরণের ট্রেকিং খুবই সহজ। তাই যারা প্রথম ট্রেকিং-এ যাচ্ছে ও আউটিং-এর সাধারণ নিয়ম কানুনগুলো জানে তারা এই ধরণের ট্রেকিং-এ স্বাচ্ছন্দ

বোধ করবে। অন্য দিকে অভিযানমূলক ট্রেকিং যারা পছন্দ করে তারাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

● হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং ঃ

এই ধরণের ট্রেকিং-এ ট্রেকারদের উঁচু গিরিপথ বা পাসগুলি এবং তুষারাবৃত অঞ্চল, গ্লেসিয়ার, এবং খাড়া ও দুরারোহ পাহাড়ের অংশ অতিক্রম করতে হতে পারে। এ সবের জন্যে উঁচু মানের জামাকাপড় ও ক্যাম্প করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যার মধ্যে হালকা টেন্ট এবং আইস এক্স, ভাল স্লিপিং ব্যাগ প্রয়োজন। এ ছাড়াও দড়ির ব্যবহার জানা খুবই দরকার। এ সমস্ত বস্তু এবং প্রয়োজনীয় খাবার দাবার এই ধরণের ট্রেকিং-এ সবই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ এ সব জায়গাগুলি জন বসতি থেকে সব সময়ই অনেক দূরে।

এই ধরণের ট্রেকিং-এ অন্তত সেট প্যাটার্ন ট্রেকিং-এর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন লোকের যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া সাধারণ পর্বতারোহণের মোটামুটি শিক্ষাও এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

ট্রেকিং মানে বোঝা পিঠে নিয়ে চোখ বুজে পথ চলা নয় ঃ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার অজস্র গবেষণার উপকরণ ছাড়িয়ে আছে হিমালয়ে। তাই বিজ্ঞানীরা প্রতিবছরেই নানা ধরণের অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজে হিমালয়ে যান। এ সমস্ত কাজে তাদের পায়ে হেঁটেই যেতে হয়।

সাধারণ একজন ট্রেকার, তার যদি পাখী ভাল লাগে তবে হিমালয়ে গিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে যাবে। এত বিভিন্ন ধরণের পাখী হিমালয় ছাড়া ভারতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। একটি দূরবীন আর ভারতীয় পাখী সম্পর্কে একটি বই হাতে নিয়ে গেলে এক বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ঘরে ফিরবে।

সুনীল আকাশে গ্লাইডিং-এ রত বিরল প্রজাতির গোল্ডেন ঈগল। সোনালী ওরিওলি বা বিরাট লেজ ওয়ালা ম্যাগপাই, বিভিন্ন ধরণের পাহাড়ী বুল বুল ও ময়না এ সবই একজন ট্রেকার চোখ খুলে পথ হাঁটতে হাঁটতে দেখে নিতে পারে।

এছাড়া আছে ফুল। হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ধরণের ফুল ছড়িয়ে আছে। হিমালয়ান ব্লু-পপি তো জগৎ বিখ্যাত। হাজার হাজার প্রজাতির এই ফুলের খবর হিমালয়ে বিভিন্ন পর্বতাভিযানের সঙ্গী উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা বিগত একশ বছরে পেয়েছি। এই ফুলের রাজ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতেও অনেকে যান। তাছাড়া বিভিন্ন লতাগুল্মের প্রাপ্তিস্থান এবং সেগুলির বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ভেষজ গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে হিমালয়ের গুরুত্ব তুলনাহীন।

একজন বিজ্ঞানী না হয়েও যে কোন পরিবেশ সচেতন মানুষের এসব দেখার প্রয়োজন আছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ট্রেকিং জীবনের সঙ্গে

জড়িয়ে আছে। এটি তাদের দেশে এক ধরণের শরীর চর্চা। প্রতিটি সপ্তাহান্তে তারা বেরিয়ে পড়ে। প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে সারা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির জনসাধারণ ট্রেকিংকেই বেছে নিয়েছে। ইউরোপের ট্রেকাররা সুযোগ পেলে যেভাবেই হোক বের হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ভাবে ওরা ট্রেকিংকে ভাগ করে নিয়েছে।

ইউরোপে আজকাল সাধারণত চার ধরণের ট্রেকিং জনপ্রিয়। ● **ব্যাক প্যাকিং ● লিভিং অফ দি ল্যাণ্ড ● ডু ইট ইয়োর সেল্‌ফ ● থ্রু ট্রেকিং এজেন্সি।**

ব্যাক প্যাকিং এর বাংলা "তল্পি কাঁধে চলা" হয়তো করা যায়। এই ধরণের ট্রেকিং-এ ট্রেকার তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পিঠের রুকস্যাকে বয়ে নিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো কোনও রাস্তা ধরে চলে। খাওয়া শোওয়া সবই যখন যেমন, তখন তেমন। এ যেন সেই আমাদের পুরনো দিনের উদাস পথিকের ছবি। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব একটা কিছু নতুন নয়। তবে বর্তমান অবস্থায় হিমালয়ে যেহেতু সব জায়গায় রাস্তা নেই। পানীয় জলের সমস্যা ছাড়াও গ্রামগুলিতে থাকার সমস্যা এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সংগ্রহের সমস্যা আছে এবং আছে ভাষার সমস্যা, ফলে বিপদ ও দুর্ঘটনার সময় ট্রেকারদের যথাযথ চিকিৎসা ও সাহায্য না-ও মিলতে পারে।

● লিভিং অফ দি ল্যাণ্ড ঃ

এই ধরণের ট্রেকিং-এ ট্রেকার এক বা একাধিক পোর্টার বা মালবাহক সংগ্রহ করে। এবং স্থানীয় খাদ্য ও বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে পথ চলে।

কিন্তু এই অবস্থায় স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও পানীয় জল না পাওয়া গেলে শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা যথেষ্ট। তাই ট্রেকারকে এমন রুট বেছে নিতে হবে যেখানে খাবার ও বাসস্থান মেলা সম্ভব। স্থানীয় জনসাধারণ অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব বাসস্থান ব্যবহার করতে না-ও দিতে পারে। তা ছাড়া বাসস্থান পাওয়া সম্ভব হলেও অপরিচিত পরিবেশ, কোলাহল, ধোঁয়া ইত্যাদি নানা কারণে যথাযথ বিশ্রামলাভ সম্ভব হয় না। ফলে ট্রেকার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই ধরণের ট্রেকিং-এ রুট পরিবর্তন ইত্যাদি যথেষ্ট ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া পোর্টার বা স্থানীয় জনসাধারণ ইত্যাদির সঙ্গে অযথা ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদি নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

● ডু-ইট ইয়োরসেলফ্ ঃ

এই ক্ষেত্রেও একজন ট্রেকার তার সমস্ত ব্যবস্থা নিজেই করে থাকে।

খাদ্য, সরঞ্জাম এবং মালবাহক সংগ্রহের পর একজন স্থানীয় গাইড সংগ্রহ করে ট্রেকার পথ চলে। গাইড স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে ট্রেকারকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করে।

খুব স্বল্প খরচের মধ্যে এই ধরণের ট্রেকিং সম্ভব। তবে গাইড ও পোর্টারদের সঙ্গে এই ধরণের ট্রেকিং-এ খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। এদের দ্বারা প্রতারণার সম্ভাবনা যে একবারে থাকে না তা নয়। এই কারণে এই ধরণের ট্রেকিং-এর সময় সমস্ত রাস্তাঘাটের বিবরণ, পথে খাবার দাবার পাওয়া যাবে কি না, এ ছাড়া বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও আগেই পূর্ণ বিবরণ ট্রেকারকে সংগ্রহ করে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে উচিত কোনও রেজিস্টার্ড সংস্থা থেকে পোর্টার ও গাইড সংগ্রহ করা।

● থ্রু ট্রেকিং এজেন্সি ঃ

যাদের সময় কম কিন্তু অর্থব্যয় করতে সক্ষম তারা এইভাবে ট্রেকিং করতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রেকিং-এর সমস্ত দায়িত্ব ঝামেলা উক্ত এজেন্সিই বহন করে থাকে।

এতক্ষণ বিদেশের ট্রেকিং-এর ধারাগুলি আমরা হিমালয়ে ট্রেকিং-এর পরি-প্রেক্ষিতে দেখেছি। কিন্তু ওদেশে ওরা এই ভাবেই ট্রেকিং-এ বের হয়। এবং যেহেতু ট্রেকিং ওদেশে একটি জনপ্রিয় স্পোর্টস তাই রাস্তা ঘাটে বিপদআপদে ওদের খুব বেশি চিন্তিত হতে হয় না। এবং ট্রেকারদের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় বিপদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে ঢালাও সাহায্যের ব্যবস্থা থাকে।

ইউরোপীয় দেশগুলিতে ট্রেকিং এতই জনপ্রিয় যে প্রতি বছর হাজার হাজার বিদেশী ট্রেকার নেপাল হিমালয় ও ভারতীয় হিমালয়ের বিভিন্ন ট্রেকিং-রুটে ট্রেকিং করতে আসে।

ইউরোপের দেশ গুলিতে ধারণা ট্রেকিং-এর মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হয়। কাজেই ট্রেকাররা তাদের দেশকে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করে তুলবে।

আমাদের দেশে সংগঠিত ট্রেকিং-এর জন্ম খুবই সাম্প্রতিক। যদিও হিমালয়ে তীর্থ, বাণিজ্য ভাবনা, সার্ভে বা শিকার করতে যাওয়া নতুন নয়। কিন্তু প্রকৃত ট্রেকিং বলতে বর্তমানে যা বোঝায় সে সব সত্যি বলতে শুরু হয়েছে তেনজিং নোরগের এভারেষ্ট অভিযান সফলতার পরে। আসলে যাই বলা হোক না কেন, ওই একটি ঘটনাই বর্তমান ভারতীয় প্রজন্মকে পর্বতারোহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। ট্রেকিং ছাড়া পর্বতারোহণ সম্ভব নয়। এই বোধ ছাড়া আরও গভীর কিছু ট্রেকিংকে ক্রমশই জনপ্রিয় করে তুলছে।

এখন বিভিন্ন পর্বতারোহণ সংস্থাগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল সকলেই ট্রেকিং-এ উৎসাহী হয়েছে। এবং তারা বিভিন্ন সময় হিমালয়ে ট্রেকিং-এ যাচ্ছে। কিন্তু তবুও বর্তমান প্রজন্মের অভিভাবকদের অনেকেই ট্রেকিং-এর প্রয়োজনীয়তা এবং আসলে বস্তুটা কী এ সম্পর্কে খুবই কম ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন পাহাড় মানেই মৃত্যু। ওখানে সব সময় ধস, অ্যাভেলান্স, দুর্ঘটনা, জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে মানুষ মারা যাচ্ছে। তাই তাঁরা ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে পাঠাতে ভয় পান।

একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে হিমালয়ের ট্রেকিং-এ যাওয়ার মূল অসুবিধা হিমালয়ের অবস্থান। সমতল ভূমি থেকে এর দূরত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কাছে অর্থনৈতিক ও সময়ের সমস্যা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও স্বাভাবিক ভাবে আমরা জাতীয় জীবনে শরীর চর্চা ও শারীরিক পটুতার প্রতি উদাসীন। মনে করি ওসব পুলিশ মিলিটারীর জন্যই দরকার। এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া প্রয়োজন। একজন তাগড়াই পুলিশ বা মিলিটারীর চেয়ে একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বিজ্ঞানী বা কৃষ্টিবান মানুষ যে কোনও সমাজের অনেক বেশি উপকারে আসবে। স্বাস্থ্যই জাতীর সম্পদ এই প্রবাদ বাক্য বাস্তবে পরিণত করার দিন এসেছে।

সংক্ষেপে বলা যায় ট্রেকিং বিশেষত হিমালয়ে সে মানুষের নিজের আনন্দের জন্যই হোক বা কোনও বৈজ্ঞানিক অভিযান বা গবেষণামূলক কাজের জন্যই হোক আখেরে তা দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

ট্রেকিং এই ব্যাপারটাকে যদি ঠিক ঠিক বোঝা যায়, এবং সঠিক ভাবে পরিচালিত করা যায় তবে তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে অভিযানমূলক ক্রিয়াকলাপের স্পৃহা ও প্রকৃতি সচেতনতা বাড়াবে। দেশের দূরাধিগম্য গ্রামীন জন জীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের আশা ও স্বপ্নকে সঠিক পথে পরিচালনায় সাহায্যকারী হবে। নিজেদের দৃঢ়চেতা ও সুচরিত্রের অধিকারী করে তুলবে। দেশের বিভিন্নতার মধ্যে একতা এই বোধ, এবং ভারতীয় কৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

পরিকল্পনা

সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া কোন পর্বতাভিযান বা ট্রেকিং সফল হতে পারে না। এই পরিকল্পনায় ত্রুটি থাকা মানে সমস্ত দলটিকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। পর্বতারোহণ বা ট্রেকিং দুটিতেই জীবনের ঝুঁকি আছে। লো-অলটিচিউড বা হাই-অলটিচিউড যাই হোক না কেন, একজন ট্রেকারকে অপরিচিত কষ্টসাধ্য পাহাড়ী পথ, স্টোনফলিং-জোন, গভীর জঙ্গল, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, রাস্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ঝর্ণা, পিছল নড়বড়ে পাথর, বা বিপজ্জনক খাড়াই ঢাল, স্কী-জোন বা অ্যাভেলান্স-জোনের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়। সেখানে বিন্দুমাত্র অসতর্কতা বা ভুল পরিকল্পনা চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। এগুলি দুর্ঘটনা। কিন্তু আমরা সতর্ক হলেই এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনাগুলি এড়িয়ে যেতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন ট্রেকিং শুরুর আগেই সঠিক পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা আর কিছুই নয় কিছু নিয়ম কানুন সুনির্দিষ্ট ভাবে মেনে চলা। এই নিয়ম কানুনগুলো আমরা বিভিন্ন ট্রেকার ও মাউন্টেনিয়ারদের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি। ট্রেকিং-এর পরিকল্পনার সময় পূর্বসূরী ট্রেকার ও মাউন্টেনিয়ারদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকেই পাথেয় করে চলতে হবে।

ট্রেকিং-এর পিছনে যদি কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে তবে পরিকল্পনার সময় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তা বিচার করতে হবে। ধরা যাক যারা ট্রেকিং-এ যাচ্ছে তাঁরা যদি ছুটি কাটানো বা নিছক আনন্দ বা তীর্থযাত্রার মনোভাব নিয়েই যায়, সেখানে যে ভাবে পরিকল্পনা করা হবে, অন্যদিকে যখন কোনও দল হিমালয়ের কোনও অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধানে যাচ্ছে তখন তার পরিকল্পনা নিশ্চয় আলাদা হবে। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত।

বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ট্রেকিং হয়। একদল যায় মূলতঃ ছুটি কাটানো আর আনন্দ উপভোগ করতে। শহরের এক ঘেঁয়ে জীবন যাত্রার থেকে মুক্তি পেতে তারা পাহাড়ে যায়। কেউ যায় পাহাড় পর্বত নিসর্গ দৃশ্যের ছবি তুলতে। তেমনি পক্ষীবিশারদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, ভূগোল-বিশারদ, নৃ-তত্ত্ববিদ, এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজের জন্য যেতে পারে। তাছাড়া পর্বতাভিযান বা হিমালয়ের অজানা অঞ্চলের খোঁজেও কেউ কেউ যায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরণের হবে। এবং সাজ সরঞ্জামও বিভিন্ন ধরণের হবে।

তবে পাহাড়ে হাঁটার আনন্দ আর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে যারা যায় তাদেরকে আমরা সাধারণ ট্রেকার হিসেবে ধরে নেব। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করবো।

দল নির্বাচন

ট্রেকিং যখন কোনও বিশেষ সংস্থা মারফত যেমন—এন, সি, সি, ইউথ হোস্টেল, বিশ্ববিদ্যালয়, বা স্কুল কলেজের মাধ্যমে হয় তখন দল নির্বাচনের বিষয়ে উদ্যোক্তারাই মাথা ঘামায়। কিন্তু স্ব-উদ্যোগে ট্রেকিং করতে হলে দল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

কাজেই ট্রেকিং-এ যাওয়া হবে এটা স্থির হয়ে গেলে দল নির্বাচনের প্রশ্ন আসে। উল্টোপাল্টা সদস্য দলে থাকলে আনন্দ দূরে থাকুক পুরো ব্যাপারটাই মাঠে মারা যায়। সমমনোভাবাপন্ন, পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে, মোটামুটি সমান বয়সের এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্বার্থপরতাহীন সদস্যদের দলে নিতে পারলেই ভাল হয়। কষ্টসাধ্য ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে বয়স একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলে বিভিন্ন বয়সের সদস্যের উপস্থিতি সমস্যা বাড়ায়। কম বয়সী বেশি শারীরিক শক্তি সম্পন্ন সদস্যের সঙ্গে বয়স্ক সদস্য সমান তালে হাঁটতে না পারার জন্য পেছিয়ে পড়তে পারে। সেই কারণে দলে সমবয়স্ক সদস্য রাখতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে এই সমস্যা এড়ানোর জন্য বয়স্কদের জন্যে একটি বা দুটি ঘোড়া বা মিউলের

ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এই ঘোড়া বা মিউল দলের বয়স্ক অসুস্থ ও ক্লান্ত সদস্যদের বহন করবে।

দলের সকল সদস্যই সব সময় যে কোনও ধরণের অসুবিধা বিপদ ইত্যাদির সম্মুখীন হওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে, এবং এর জন্য কোনও রকম বিরক্তি বা ক্ষোভ প্রকাশ করবে না।

বৃষ্টি, তুষারপাত ও অসুস্থতার কারণে কোনও সদস্য চলতে অপারগ হলে, সেই সদস্যের জন্য কয়েকজনের সদস্যের ট্রেকিং স্থগিত রাখতে হতে পারে, এবং এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সকলকেই মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যের প্রয়োজনে যে কোনও রকমের স্বার্থত্যাগ করার মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে।

সময়ের হিসাব

দল তৈরী হয়ে গেলে কখন যাওয়া হবে এবং কতদিন এজন্য সময় পাওয়া যাবে সেটি একটি সমস্যা, কারণ ছুটি মানুষের অপর্যাপ্ত ভাবে পাওনা হয়না। কাজেই ট্রেকিং-এর সময়সূচী নির্দ্ধারণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কদিন ট্রেকিং-এর জন্য ধরা হবে তার চেয়ে সব সময় অন্ততঃ দু-তিন দিন বেশি সময় হাতে রাখতে হবে। এই সতর্কতা খারাপ আবহাওয়া, কোনও সদস্যের শরীর খারাপ, ছোটখাট বিপদ-আপদ ইত্যাদির জন্য।

হাই-অলটিচিউডে যে কোনও মুহূর্তে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে, এবং এর ফলে পুরো দলটাই এক-দুদিন থেকে শুরু করে কয়েক দিন পর্যন্ত বসে যেতে পারে। কাজেই হাতে সময় বেশি রেখে ট্রেকিং-এ যাওয়া ভাল। সমবয়স্ক, সমভাবাপন্ন, ছোট দলের পক্ষেই নির্দিষ্ট সময়ে কোনও ট্রেকিং সম্পন্ন করার সম্ভবনা বেশি থাকে।

বাজেট

দল তৈরীর পর বাজেট। কী ভাবে কী খরচ হবে তা ঠিক করতে হবে। টাকা পয়সা বেশি থাকলে বড় দল নিয়ে বিরাট মাপের ট্রেকিং সম্ভব। ছোট দল এবং সীমিত অর্থের সংস্থান থাকলে সব কিছুই বুঝেসুঝে চলতে হবে। পথের খরচ, ট্রেন ভাড়া, জিনিসপত্র সংগ্রহের খরচ, পোর্টার ও গাইডের খরচ ইত্যাদির একটা খসড়া তৈরী করে নেওয়া দরকার। সমস্ত হিসাব ধরে নিয়ে কিছু বেশি টাকা, বিপদ-আপদের জন্য হিসাবে ধরে রাখতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে খরচ সীমাবদ্ধ রাখতে হলে বেস-টাউনগুলোতে অযথা দামী হোটেলে উঠে বা প্রচুর খরচ করে বিলাসিতা করা চলবে না।

যাদের প্রচুর অর্থ আছে তারা যখন ট্রেকিং এজেন্সি মারফত বিলাস বহুল

ট্রেকিং-এ যায় তখন সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এমন কি হাই-অলটিচিউডেও তাদের জন্য ডাইনিং টেবিল পেট্রোমাক্স আলো এ সব নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণ ট্রেকারদের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বা ছবি তুলতে অথবা গবেষণামূলক কাজের জন্য যারা হিমালয়ে যাবে, তারা অবশ্যই তাদের বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং জিনিসপত্র সঙ্গে নেবে। এবং এই প্রসঙ্গে আনুসঙ্গিক পরিবহণ ইত্যাদি খরচ পত্রের হিসাব আগে ভাগেই সুনির্দিষ্টভাবে করে, ট্রেকিং-এর সাধারণ খরচ থেকে তা বাদ দিয়ে হিসাব করে নিতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে হিসাব রাখার জন্য একটি আলাদা ফাইল বা নথি থাকবে।

স্থান ও সময় নির্বাচন

আগেই বলা হয়েছে ট্রেকিং-এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যখন কোনও দল বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অনুসন্ধানের জন্য হিমালয়ে যাচ্ছে তারা নিশ্চয় এমন একটি বিশেষ অঞ্চলকেই বেছে নেবে, যেখানে অনুসন্ধানের উপকরণ পাওয়া যাবে। তবে সাধারণ ট্রেকার যারা হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বা ট্রেকিং-এর আনন্দের জন্য হিমালয়ে যাচ্ছে, তারা নিশ্চয় এমন জায়গা বেছে নেবে যেখানে খরচের অনুপাতে সব চেয়ে বেশি আনন্দ পাওয়া যাবে। অথবা এমন জায়গা, যেখানে আগে কখনও যাওয়া হয়নি।

কোন সময়ে ট্রেকিং করা হবে সেটিও একটি চিন্তা ও পরিকল্পনার বিষয়। সাধারণত গ্রীষ্মে হিমালয়ের ট্রেকিং নানা কারণে সুবিধা জনক। প্রথমত সমতল ভূমির গ্রীষ্মের প্রখরতা থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়ত এই সময়ে বরফ গলে যাওয়ার জন্য হিমালয়ের অনেক গভীরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু লাহুল স্পিতি অঞ্চল, পাঙ্গী ও কিন্নর ভ্যালি যা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, এবং জম্মু কাশ্মীরের জাঁস্কর ও লাদাখ অঞ্চলে জুলাই-আগষ্ট মাসে ট্রেকিং সুবিধাজনক। কারণ এই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই সামান্য এবং প্রবেশের জন্য পাসগুলি ঐ সময় মুক্ত থাকে।

ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত পৃথিবীর এই বৃহত্তম পর্বতমালার সবটা কিন্তু আমাদের কাছে উম্মুক্ত নয়। এর কারণ কিছুটা রাজনৈতিক কিছুটা ভৌগলিক। সিকিম, ভুটান, অরুণাচল আমাদের হাতের কাছে। যাকে পূর্ব হিমালয় বলা হয়। মধ্য হিমালয় বলতে নেপাল। পশ্চিম হিমালয়ে জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তর প্রদেশ।

পূর্ব হিমালয়ের অরুণাচল অত্যন্ত দুর্গম, তাছাড়া পর্বতারোহণের উপযোগী শৃঙ্গ কম থাকায় পর্বতারোহীদের আকর্ষণ এই অঞ্চলে নেই বললেই

চলে। তবে ট্রেকারদের কথা আলাদা। তাদের গতি সর্বত্র।

ভূটান ও নেপাল দুটি বিদেশী রাষ্ট্র। একমাত্র সরকারী পর্যায় ছাড়া এ দেশের পর্বতারোহণ সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক কারণে ওখানে পর্বতারোহণ চালানো সম্ভব নয়। তবে নেপাল ট্রেকারদের স্বর্গ। অসম্ভব সুন্দর অনেক ট্রেকিং-রুট আছে ওই অঞ্চলে। মুক্তিনাথ, অন্নপূর্ণা বেস-ক্যাম্প, এভারেষ্ট বেস-ক্যাম্প, গোঁসাই কুণ্ড, ল্যাংট্যাং ভ্যালি, এমনি অসংখ্য ট্রেকিং-রুট সারা পৃথিবীর ট্রেকারদের কাছে পরিচিত।

পশ্চিম হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ পাকিস্থান জবর-দখল করে রেখেছে। এই জবরদখল অংশটুকু ছাড়া পশ্চিম হিমালয়ের বাকি অংশগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। কুমায়ুঁ, গাড়োয়াল, কিন্নর, স্পিতি, লাহুল, কুলু, চাম্বা ও জম্মু-কাশ্মীর। এই অঞ্চলে যেমন অসংখ্য ট্রেকিং-রুট আছে তেমনি আছে অসংখ্য পর্বতারোহণের উপযোগী শৃঙ্গ।

এই যে বিরাট অঞ্চল এর সবটুকু দেখা কোনও একজন মানুষের সারা জীবনে সম্ভব নয়। বর্তমান রাস্তা ঘাটের সুবিধা অসংখ্য পর্বতারোহণ ও ট্রেকিং হওয়া সত্ত্বেও, হিমালয়ের বহু অঞ্চল এখনও অজ্ঞাত থেকে গেছে। কাজেই গোটা হিমালয়ের সবটুকু আমাদের কাছে উন্মুক্ত না হলেও খুব একটা অসুবিধার কারণ নেই। অসংখ্য নতুন অভিযান এখনও হিমালয়ে চলতেই থাকবে।

তবে আরম্ভ হিসেবে প্রথম বার যে কোনও একটি পরিচিত রুট পছন্দ করাটা মন্দ নয়। এর মধ্যে কোন কোন ট্রেকিং-রুট আবার রথ দেখা কলা বেচার মতো। অর্থাৎ একাধারে তীর্থস্থান ও ট্রেকিং-রুট। যেমন কেদারনাথ অমরনাথ, যমুনোত্রী, গোমুখ, ত্রিলোকনাথ, মুক্তিনাথ, মণিমহেশ ইত্যাদি।

এছাড়াও ট্রেকিং-এর পূর্ণ আনন্দ পাওয়ার মত পরিচিত সহজ রুটও যথেষ্ট আছে। পিণ্ডারী-গ্লেসিয়ার, মিলাম-গ্লেসিয়ার, কোলাহাই-গ্লেসিয়ার খাৎলিং-গ্লেসিয়ার, হর-কি-দুন, ভ্যালি-অব-ফ্লাওয়ার্স, হেমকুণ্ড এসব খুবই আকর্ষণীয় সহজ ট্রেকিং-রুট।

তথ্য সংগ্রহ

স্থান নির্বাচন এবং কতদিনের মধ্যে ট্রেকিং শেষ করে ফিরে আসা হবে এগুলি ঠিক হয়ে যাবার পর প্রথম কাজ নির্দিষ্ট জায়গাটির রাস্তা ঘাটের বিবরণ সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ। এই সব তথ্য ঐ বিশেষ অঞ্চল যে রাজ্যে অবস্থিত সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পর্যটন বিভাগের স্থানীয় অফিস থেকে পাওয়া যাবে। অথবা এই সম্পর্কে প্রকাশিত বাজারে সহজলভ্য বইগুলি থেকেও পাওয়া যাবে। প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য দলের প্রতিটি সদস্যের হাতে তুলে দিতে হবে। যাতে

সকল সদস্যই তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে শুরু করে গন্তব্য স্থল পর্যন্ত পুরো রাস্তার আনুপূর্বিক বিবরণ এবং তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে সম্পূর্ণ তথ্য হয়তো সবক্ষেত্রে সংগ্রহ সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু যতদূর সম্ভব তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করা উচিত। শুধু ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে নয় শৃঙ্গ আরোহণের ক্ষেত্রেও এই তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ যত সফল ও বিশদ ভাবে সম্ভব হবে, পরিকল্পনা ততই নিখুঁত হবে।

পর্যটন বিভাগের তথ্য বা এই সম্পর্কে বই ছাড়াও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ভূগোল সম্পর্কে। এমনকি স্কুলপাঠ্য ৮ম—১০ম মানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বই-গুলিও এ সম্পর্ক যথেষ্ট সাহায্য করবে, এবং উঁচু পর্যায়ের বইগুলি তো বটেই। দেখা গেছে ট্রেকিং-এ যারা যায় তাদের একটা বিরাট অংশের গন্তব্য স্থানের ভৌগলিক জ্ঞান বিন্দুমাত্র নেই। এর ফলে শুধু ট্রেকিং নয় বহু পর্বতাভিযানও ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ পুরো অভিযানের পিছনে যে অর্থ, সময় ও সামর্থ ব্যয় করা হয় তার সামান্যতম অংশ ভূগোল বই-এর পিছনে ব্যয় করা হলে ব্যর্থতা এড়ানো যেত।

ঋতু ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের ভৌগলিক খণ্ডগুলি নিত্য পরিবর্তনশীল। দেখা গেছে, একই বছরে একই অঞ্চলে দুটি ভিন্ন দল একটি বিশেষ শৃঙ্গ অভিযানে গিয়ে মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। হিমালয়ের চরিত্রই এই। পাহাড়ের উচ্চতায় স্থান ও পথগুলির চরিত্র সময়ের তফাতে এমনিই পরিবর্তন হয় যে তা অগাধ বিস্ময়। এই মুহূর্ত্তে যা চেনা পর মুহূর্তেই তা অচেনার আড়ালে হারিয়ে যায়।

শুধু ভূগোল বই নয় সমাজ-তত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বইগুলিতেও হিমালয়ের জনজীবনের বহু অজানা তথ্য পাওয়া যাবে। এই বইগুলিও যত্ন নিয়ে পড়তে হবে। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, এবং অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে অযথা হয়রাণ হতে হয় না।

মনে করা যাক একটি বিশেষ দল হিমালয়ের কিন্নর জেলায় সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পর্বতাভিযানে বা ট্রেকিং-এ যাবে। তা সেই অভিযান সম্ভব হবে কি? প্রথমত কিন্নর জেলায় ঐ সময় থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। হয়তো দৈবক্রমে আবহাওয়া ভাল পাওয়া গেল। এখন সমস্যা হবে পোর্টার নিয়ে। এ সময় ওখানে পোর্টার পাওয়া অসম্ভব। এই অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষেরা কুমায়ুঁ হিমালয়ের মতো শীতে বাসা বদল করেনা। তাই শীতের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করার জন্য আগে থেকেই তারা জ্বালানী সংগ্রহ করতে বের হয়ে পড়ে। দিনের শেষে, কখনও দু-তিন দিন পরেও তারা ঘরে ফেরে। প্রচুর আপেল উৎপন্ন হওয়ার জন্য স্থানীয়

জনসাধারণের সবলেই আথিক সঙ্গতি সম্পন্ন, কাজেই টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা পোর্টারের কাজ করে তারা সকলেই নেপালের লোক। স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ঐ সময় তাদের না-ও পাওয়া যেতে পারে। এবং ওই সব লোকের পর্বতারোহণ নয়, আপেল উৎপাদনের সঙ্গেই জীবন ও জীবিকা জড়িত।

এমনি ভাবেই সিকিমে যাবার সব চেয়ে ভাল সময় মে বা অক্টোবর মাস। গাড়োয়াল কুমায়ুতে মে-জুন বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস।

সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় যেতে হবে। আর পরিকল্পনার সময় এ কথা ভুললে একবারেই চলবে না।

● শৈলারোহণের সাধারণ জ্ঞান

সামান্য একটু আধটু শৈলারোহণের জ্ঞান না থাকার জন্য অনেক সময় ট্রেকারদের অযথা নানা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। অনেক সময় ফিরেও আসতে হয়। পরিকল্পনার সময় সদস্যদের শৈলারোহণ শিবিরে যোগদানের বিষয়টি তাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। বিষয়টি কষ্টকর, কঠিন বা ভয়ঙ্কর কিছুই নয়। বরং মজা আর আনন্দের। পর্বতারোহণ ক্লাবগুলি প্রতি বছর ডিসেম্বর—জানুয়ারী মাসে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় ৩/৪ দিনের এই শিবির করে থাকে। কটা দিন পাহাড় চেনা আর ছুটির আনন্দে কেটে যায়। আর এরই মধ্যে একজন ভবিষ্যত ট্রেকারের শেখা হয়ে যায় অনেক কিছুই।

এই ট্রেনিং নেওয়া যদি একান্তই সম্ভব না হয় তবে কিন্তু খুব সহজ রুট বাছার কথা গোড়া থেকেই চিন্তা করতে হবে। হিমালয়ে তেমন রুটেরও অভাব নেই।

ট্রেকিং এবং ম্যাপ

স্কুল কলেজে আমরা যে ধরণের মানচিত্র বা ম্যাপ দেখেছি ট্রেকিং বা পর্বতাভিযানের ম্যাপ তার চেয়ে আলাদা। অর্থাৎ সাধারণ ম্যাপের চেয়ে কিছু বেশি তথ্য সম্বলিত সেই ম্যাপ। যে অঞ্চলে অভিযান হবে সেই অঞ্চলের বিশেষ মানচিত্রই বলে দিতে পারে রাস্তা কী রকম হবে, তাঁবু খাটাবার জায়গা পাওয়া যাবে কি না। অথবা অন্য সুবিধা অসুবিধার কথা।

ম্যাপের মধ্যে যেমন রাস্তা, গ্রাম, পাহাড়ের চূড়া এ সব দেখানো থাকে তেমনি সমোচ্চ রেখা (contour) দিয়ে বিভিন্ন জায়গার অবস্থিতিও দেখানো হয়। এই সমোচ্চ রেখা দেখে সমস্ত খুঁজে পেতে অভিযান পথ বের করে নিতে হয়। ম্যাপ ছাড়া অজানা অঞ্চলে ট্রেকিং বা অভিযানের মানেই অনিশ্চয়তা আর অসফলতা। ম্যাপ দেখা যত্ন করে শিখতে হবে। বিশেষ করে কনটুর ম্যাপ দেখতে জানেন, এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে এই ম্যাপ দেখা শিখে নেওয়া যায়। অথবা পর্বতারোহণ সংস্থাগুলি প্রতিবছর যে শিবির বা শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত করে সেখানেও ম্যাপ দেখা শিখে নেওয়া যায়। প্রচণ্ড ভাবে সাজ-সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও যে কোন অভিযাত্রী দল শুধুমাত্র সঠিক ম্যাপের অভাবে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। নানা ধরণের ম্যাপ পাওয়া যায় ঃ—

ট্রেকিং ম্যাপ ● রিলিফ ম্যাপ ● ফটোগ্রাফিক ম্যাপ ● টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ।

● ট্রেকিং ম্যাপ ঃ

এই ম্যাপগুলি সাধারণতঃ সরকারী পর্যটন বিভাগ বা পর্যটন সংস্থা গুলি তৈরী করে থাকে। কোন কোন এলাকা দিয়ে যাবার পথ, পথে গ্রাম বা বিশ্রাম গৃহ পাওয়া যাবে কিনা এসব ঐ ম্যাপে বলা থাকে। এই ম্যাপে দূরত্ব সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

● রিলিফ ম্যাপ ঃ

এই ম্যাপের মান খুব বড় স্কেলে হয়ে থাকে। বিভিন্ন সরকারী কাজে, প্ল্যানিং এর কাজে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ম্যাপ থেকে এলাকার মোটামুটি ধরণ ধারণ বুঝতে পারা যায়।

● ফটোগ্রাফিক ম্যাপ ঃ

আকাশ থেকে নেওয়া ফটোগ্রাফের সাহায্যে এই ম্যাপ তৈরী হয়। বিদেশের পর্বতারোহীরা সাধারণত এই ধরণের ম্যাপ ব্যবহার করে থাকে। আমাদের দেশে এই ধরণের ম্যাপ পাওয়া যাবে না। এর কারণ হিমালয়ের বহু অংশ সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত নয়। ফলে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের ছবি আকাশ থেকে তোলা এবং সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই ম্যাপ বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। যা সাধারণ পর্বতারোহী ও ট্রেকারদের কাছে আশা করা যায় না। তা ছাড়া হিমালয়ের রূপ বিভিন্ন ঋতুতে পাল্টে যায়। শীতকালে তোলা ছবির সঙ্গে গ্রীষ্মে তোলা ছবির মিল খুঁজে পাওয়া যাবেনা। দুই ঋতুতে হিমালয় একেবারেই ভিন্ন।

● টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ঃ

যে কোনও প্রাথমিক সমীক্ষার কাজে এই ম্যাপের ব্যবহার সর্বাধিক। এবং তা তৈরীও হয় সেই ভাবেই। সঠিক ও প্রণালীসম্মত এই ম্যাপে যে কোনও স্থানের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। সাধারণত ১ : ৫০,০০০ বা ১ : ২৫,০০০ স্কেলে বা মানে এই ম্যাপ তৈরী হয়। এই টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপের মধ্যে কনট্যুর বা সমোচ্চ রেখা সন্নিবেসিত থাকে।

সার্ভে অব ইন্ডিয়া সারা ভারতবর্ষ ও হিমালয়ের এই ম্যাপ তৈরী করে রেখেছে। এবং প্রয়োজন বোধে প্রতিষ্ঠানটি যে কোনও এলাকার নির্দিষ্ট ম্যাপ প্রস্তুত করতে সক্ষম। পর্বতারোহীরা এই কনট্যুর ম্যাপ দেখেই পর্বতা-

ভিযান করে থাকে। আকাশ থেকে তোলা ছবি ও অন্যান্য সঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী এই ম্যাপ থেকে যে কোনও এলাকার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব। কনট্যুর বা সমোচ্চ রেখার সাহায্যে ভূ-প্রকৃতি বুঝতে হলে, ম্যাপ ও সমোচ্চ রেখার মান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই ম্যাপ বা মানচিত্রের মান যত বড় হবে সমোচ্চ রেখার মান তত কম হবে। সমোচ্চ রেখার মান কম হলে ভু-প্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিবর্তণও ম্যাপের থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে নিজের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য এই কনট্যুর ম্যাপ বা মানচিত্র একান্ত প্রয়োজন। এই ম্যাপ থেকে—

ক) পর্বত পৃষ্ঠের বা নদী উপত্যকার গঠন, কি ধরণের খাড়াই, শৈল শিরা গিরিবর্ত্ম, রিজ, ঢাল এই সব সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

খ) উপত্যকাটি জলপূর্ণ, শুকনো, স্থায়ী জলধারা সম্পন্ন, তুষারাবৃত, তুষার সেতু আছে কি না, এবং প্রচণ্ড জলস্রোতসম্পন্ন কি না জানা যায়।

গ) বুগিয়াল, মিউল বা খচ্চর চলার রাস্তা, মানুষের পায়ে চলার পথ, লোকালয়, গুহা, মেষপালকদের আস্তানা অথবা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড আছে কি না জানা যায়।

ঘ) স্নো-লাইন বা চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের খোঁজ পাওয়া যায়।

ঙ) ধস, স্টোন বা রক-ফলিং জোন, অ্যাভেলান্স জোন নির্দিষ্ট করা যায়।

চ) গ্লেসিয়ার গুলির গঠন, ভূ-প্রকৃতি, ক্রিভার্স জোন, গ্লেসিয়ারের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ, বরফের দেওয়াল, গ্লেসিয়াল লেক বা হিমাবাহ সৃষ্ট হ্রদ, আইস-ফল, মোরেম, বরফের গুহা, ক্লিফের অবস্থা এ সব জানা যায়।

ট্রেকিং-এ যাওয়া যখন স্থির হল

সত্যি সত্যিই যাওয়া যখন স্থির হল, তখন কিন্তু সামনে অনেক কাজ। প্রথমেই একজন দলনেতা বা লিডার নির্বাচিত করতে হবে। দলের মধ্যে ট্রেকিং সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই লিডার করা উচিত। এ ছাড়া একজন সহ-দলনেতা বা ডেপুটি-লিডার নির্বাচন করতে হবে। এ সব কাজ বেশ কিছুদিন আগেই করা উচিত। লিডারের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

লিডার প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি সভা ডেকে, দলের সকলের কাছেও কতদিনের জন্য এবং কোথায় ট্রেকিং করতে যাওয়া হবে, রাস্তার বিবরণ, সুবিধা অসুবিধা, সরঞ্জাম, খাবার-দাবার, প্রাপ্য সাহায্য, সাম্ভাব্য খরচ, সদস্যদের ব্যক্তিগত ভাবে কী কী নিতে হবে এই সব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখবে। এবং একজন **কোয়ার্টার মাস্টার**, একজন **ট্রান্সপোর্ট অফিসার** ও একজন **একাউণ্টস্ অফিসার** নির্বাচন করবে।

● **কোয়ার্টার মাস্টার** খাবারের তালিকা, রেশন এবং প্রতিদিনের রান্না ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত হবে। রান্না করতে জানা ভাল ট্রেকারের একটি অন্যতম গুণ।

● **ট্রান্সপোর্ট অফিসার** রাহা খরচ, গাড়ী ভাড়া, রিজার্ভেশন, পোর্টার গাইডের চার্জ এবং নিয়োগ এই সব দায়িত্বে থাকবে। এ ছাড়াও তার দায়িত্বে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং প্রয়োজন বোধে ভাড়া করা ইত্যাদি বিষয়ও থাকবে।

● **একাউণ্টস্ অফিসার** সমস্ত খরচের হিসাব নির্ণয় করবে ও রাখবে।

এর পরেই দলের তরফ থেকে চিঠি লিখে যে সমস্ত জায়গায় যাওয়ার জন্য সরকারী অনুমতি লাগে তা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন থাকার জায়গা ও রেস্ট হাউসে স্থান সংগ্রহ, পোর্টার গাইড সংগ্রহ, সরঞ্জাম সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

দলের সকলেই অর্থের তহবিল সংগ্রহে সাহায্য করবে। সমস্ত বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল থাকবে। এবং একটি মূল ফাইল বা নথিতে এ সমস্ত তথ্য ও চিঠিপত্রের অনুলিপি থাকবে।

ট্রেকিং চলাকালীন পর্যায়ক্রমে ন্যস্ত দায়িত্বগুলি পরিবর্তন করা উচিত। দায়িত্ব দলের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা জরুরী বিষয়। এতে ট্রেকিং-এ অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে—

ক) সক্রিয়তা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ইত্যাদি জন্মায়।

খ) সকলেরই যে কিছু দেওয়ার আছে এবং দলের সকলেই যে সমান অংশীদার এবং সমান মর্যাদা সম্পন্ন এই বোধ জাগে।

গ) দায়িত্ব পালন ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার অনুশীলন হয়,

ঘ) এবং সকলেই সব কাজ শিখতে পারে।

এই পরিবর্তন এক দিন অন্তর করা হলে ভাল হয়। পাহাড়ে পরিস্থিতি অনুসারে সকলকেই সব কিছু করতে হতে পারে। এবং এই শিক্ষা ব্যক্তি জীবনেও ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

পাহাড়ে যাওয়ার জিনিস পত্র

ট্রেকিং-এর সময় যে সমস্ত জিনিসপত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয় তা খুব একটা চোখে পড়ার মতো ব্যতিক্রমের কিছু নয়। তবে কিছু জিনিস অবশ্যই আছে যা আমাদের প্রতিদিনকার জীবন যাত্রায় ব্যবহার করতে হয় না।

দলগত বস্তুগুলি ও ব্যক্তিগত যে সমস্ত জিনিস নিয়ে যেতে হবে তার যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে সেই সরঞ্জামগুলি যত হালকা হবে, ততই ভাল। কারণ মনে রাখতে হবে এর সব কটিই ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে হবে।

থার্মোমিটার/অল্টিমিটার/তাঁবু/ওষুধ/আইস-অ্যাক্স্/দড়ি এসব দলগত ভাবে নেওয়া চলে। আইস-অ্যাক্স্ ও দড়ি হাই বা লো-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রয়োজন। পর্বতারোহণে দড়িকে জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু আইস-অ্যাক্স্ ও দড়ির ব্যবহার জানতে হবে। ওগুলির ব্যবহার জানা না থাকলে, উপকারের চেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টিই বেশি হবে। তাই এই সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।

ট্রেকিং-এর সময় পুরাণো সামান্য ছেঁড়া ফাটা গরম জামা, কোট, সোয়েটার মাংকি ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করার আদর্শ সময়। কারণ এ নিয়ে পাহাড়ে কেউ সমালোচনা বা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করবে না। পুরানো হওয়ার

জিনিসপত্রের তালিকা

[নিচে যে তালিকা দেওয়া হচ্ছে তা সাধারণ ভাবে ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। এখানে পর্বতারোহণের যে দু-চারটি সরঞ্জামের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি অবশ্যই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে হতে পারে। সাধারণ ট্রেকিং-এ এর বেশি সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই।]

১। হালকা রুকস্যাক।
২। স্লিপিং ব্যাগ।
৩। ক্যারী ম্যাট।
৪। জামা (সুতি)। মহিলাদের জন্য খাদির মোটা জামা, শোভন পোষাক।
৫। প্যাণ্ট (সুতি)
৬। গরম কাপড়ের প্যাণ্ট, জামা মহিলাদের ক্ষেত্রে স্লাক্স ও উলের জামা।
৭। পুল ওভার।
৮। হাফ সোয়েটার।
৯। উলি-কটের গেঞ্জি।
১০। সাধারণ অন্তর্বাস।
১১। বাতাস নিরোধক জামা।
১২। হালকা রেন কোট।
১৩। ম্যাঙ্কি ক্যাপ।
১৪। উলের দস্তানা বা গ্লাভস্
১৫। সাধারণ টুপি (রোদ আটকানোর জন্যে)।
১৬। উলের মোজা ২ জোড়া।
১৭। ছাতা।
১৮। সেলাই করার জন্য ছুঁচসুতো, ছোট ছুরি।
১৯। চাদর।
২০। গামছা।
২১। চিরুনি ও আয়না।
২২। সাবান।
২৩। সেভিং সেট/আফটার সেভ লোশন বা এণ্টিসেপটিক জাতীয় ক্রীম।
২৪। টয়লেট পেপার।
২৫। পলিথিনের বাড়তি একটি ব্যাগ ও একটি চওড়া সিট্।
২৬। ট্রেকিং-এর জন্য হাণ্টার জাতীয় জুতো, চটি জুতো।
২৭। সাধারণ গগ্‌লস্।
২৮। স্নো-গগ্‌লস্।
২৯। টর্চলাইট, ব্যাটারী ও বাঁশী।
৩০। জলের বোতল ও ফ্ল্যাক্স।
৩১। দূরবীন।
৩২। ক্যামেরা ও ফিল্ম্।
৩৩। থার্মোমিটার ও অল্টিমিটার।
৩৪। কম্পাস।
৩৫। রুট ম্যাপ।
৩৬। ওষুধের বাক্স (ফাস্ট এইড)।
৩৭। আইস-অ্যাক্স্।
৩৮। ছোট তাঁবু।
৩৯। কিছুটা দড়ি (সাধারণ)।
৪০। দড়ি (পর্বতারোহণের)।
৪১। রান্নার বড় ডেকচি।
৪২। প্রেসার কুকার।
৪৩। থালা, প্লেট ও ছোট মগ।
৪৪। স্টোভ, স্টোভের পিন।
৪৫। কেরোসিন।
৪৬। মোমবাতি, দেশলাই।

জন্যে এগুলি যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহারও করা যায়। এবং ইচ্ছে করলে দু একটা ট্রেকিং-এর পর ফেলেও দেওয়া যেতে পারে। তবে ট্রেকিং-এর সময় এগুলি ভাল করে সেলাই করে নিতে হবে।

গ্রীষ্মকালে ট্রেকিং করতে গেলেও পাহাড়ে পর্যাপ্ত গরম জামা কাপড় অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া উচিত। কারণ পাহাড়ে যখন তখন বৃষ্টি হতে পারে। আর বৃষ্টি হলেই সেখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তাছাড়া অতি উচ্চতায় তুষারপাতও যে কোন সময় হতে পারে। রোদ এড়ানোর জন্যে টুপি এবং ছাতা সঙ্গে রাখা দরকার। ছাতা ট্রেকিং-এর সময় আদর্শ বন্ধু। শুধু রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে নয়, পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটার জন্য লাঠির কাজ দেয় ওটি।

হাফ হাতা জামা বা হাফ্ প্যান্টের চেয়ে ফুল হাতা জামা, সোয়েটার ও ফুল প্যাণ্ট ট্রেকিং-এর সময় ব্যবহার করা উচিত। কারণ ট্রেকিং-এর সময় ট্রেকারদের গভীর জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হতে পারে। খাঁকি বা ঐ ধরণের রঙের জামা কাপড় পরা বেশি সুবিধের। ওগুলি সহজে ময়লা হয় না। বায়ু নিরোধক জামার বা পরনের জামা কাপড়ের দু-একটি এবং রুকস্যাকের রঙ গভীর লাল বা হলুদ হওয়া উচিত। এতে কোনও দুর্ঘটনা বা হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ রঙ দেখে দূর থেকে ট্রেকারকে সনাক্ত করা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সঠিক নির্বাচন এবং যথাযোগ্য ব্যবহার ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জাম বিপদ ডেকে আনে।

● জুতো ঃ

ট্রেকিং মানেই পায়ে হেঁটে চলা। আর চলার সময় সেই পা-ই যদি ঝামেলায় ফেলে তবে ট্রেকিং-এর সমস্ত আনন্দই নষ্ট। ফোস্কা পড়া পা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলা মানে গোটা দলের কাছে নিজে বোঝা হয়ে থাকা। কাজেই নির্ভাবনায় পথ চলতে গেলে জুতো জোড়া ভাল আর আরামদায়ক হওয়া চাই। নতুন চামড়ার জুতো বর্জন করতে হবে। ওতে ফোস্কা পড়বেই। তবে যদি একান্ত পরতেই হয় তবে ট্রেকিং-এ যাওয়ার আগে বেশ কয়েকদিন ওগুলো ব্যবহার করে নিতে হবে। অন্তত ততদিন, যতদিন না চামড়া নরম হচ্ছে। চামড়ার জুতোয় ক্রীম বা গ্রীজ জাতীয় বস্তু লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে অত্যাধিক চর্বি জাতীয় বস্তু লাগলে জুতোর সেলাই খারাপ হয়ে যায়। সে দিকেও নজর দিতে হবে।

বন্ধুর পথ, ঠাণ্ডা, আকস্মিক আঘাত, ধারাল পাথরের আঘাত বা বরফের স্পর্শ থেকে পায়ের পাতাকে বাঁচানোর জন্যেই জুতোর ব্যবহার। পর্বতা-

রোহণের জন্য নানা রকমের জুতোর ব্যবহার আছে। ট্রেকারদের সে সব জুতোর প্রয়োজন বড় একটা হয় না। বাজারে যে ট্রেকিং-এর জুতো পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করলেই কাজ চলে যাবে। এগুলি হালকা ও দামেও সস্তা। ক্যাম্বিসের তৈরী হওয়ার জন্যে আরামদায়ক। কম ফোস্কা পড়ে। এগুলির তলা খাঁজযুক্ত এবং রাবারের তৈরী। ফলে পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাইয়ে চলার জন্যে এই জুতোই সুবিধেজনক। জুতো পায়ের ঠিক ঠিক মাপের চেয়ে একটু বড় কেনা উচিত। যাতে দু-টি মোজা এক সঙ্গে পরা যায়।

টাইট জুতো রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত করে। ফলে খুব ঠাণ্ডার জায়গায় এরকম অবস্থায় ফ্রস্ট বাইট হয়ে যেতে পারে।

কোনও রকম অসুবিধার সৃষ্টি হলে বা ছিঁড়ে গেলে অবিলম্বে জুতো সারিয়ে নেওয়া উচিত।

জুতোর তলা খাঁজ বা গ্রিপ ভাল হওয়া চাই। যা পিছল পাহাড়ী পথ, ঘেসো জমি, বা চড়াই ভাঙতে সাহায্য করবে।

জুতো সব সময় শুকনো অবস্থায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। ভিজে জুতো আগুনে শুকানো অনুচিত। ওগুলো পরিস্কার করে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে বা দুজনের শোবার জায়গার মধ্যে রাখলে তা আপনি শুকিয়ে যাবে।

রাত্রিতে জুতো কখনই বাইরে রাখা উচিত নয়। যদি বরফ পড়ে তাহলে তো বটেই এমন কি দিনের বেলাতেও জুতো তাঁবুর ভিতরে রাখতে হবে। অতিরিক্ত এক জোড়া ফিতে কাছে রাখতে হবে।

হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর সময় যদি দীর্ঘ তুষারাবৃত অঞ্চল পার হতে হয় বা তুষারাবৃত অঞ্চলে থাকার প্রয়োজন হয় তবে সাধারণ ট্রেকিং-এর জুতো কাজ দেবেনা। তখন বিশেষ ধরণের জুতো (Vibram) ব্যবহার করা উচিত। Vibram জুতোর স্থায়ীত্ব অনেক বেশি, ওজনে কম, এবং আরামদায়ক আর তুষারাবৃত অঞ্চলে হাঁটার পক্ষে উপযোগী।

● ম্যাপ, কম্পাস, বাঁশী, টর্চ

এর সব কটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দরকারী সামগ্রী, যদিও কোনটাই খুব একটা দামী জিনিস নয়।

● **ম্যাপ / কম্পাস** ঃ ম্যাপ সম্পর্কে আগেই আলোচনা হয়েছে। যে অঞ্চলে যাওয়া হচ্ছে তার টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ থাকলে খুবই সুবিধা হয়। একটি ম্যাপ আর কম্পাস অজানা অঞ্চলে গাইডের কাজ করে।

● **বাঁশী / টর্চ** ঃ ট্রেকিং-এর সময় বিভিন্ন কারণে মূল দলটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বাঁশীর সাহায্যে দলগুলি একত্রিত হতে

প্যারে বা সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারে। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকার বদলে বাঁশীর শব্দ করা অনেক বেশি সঠিক। কারণ চিৎকার করে একই সময়ে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বক্তব্য রাখতে পারে। ফলে শব্দগুলি মিশে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবে। ট্রেকিং-এর আগে বিভিন্ন ধরণের বাঁশীর শব্দ কী কী অর্থে ব্যবহার করা হবে তা দলের সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

একইভাবে অন্ধকারে টর্চের আলোর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা বা বিপদ-বার্তা পাঠানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা ছাড়া অন্ধকারে পথ দেখা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনে টর্চের ব্যবহার তো আছেই। বিপদবার্তা বাঁশী ও টর্চের সাহায্যে পাঠানোর জন্যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা উচিত। যেমন ছ বার বাঁশীর শব্দ করা বা টর্চের আলো দেখানো বিপদ সংকেত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি এক মিনিট অন্তর অন্তর এই পদ্ধতি চালাতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে এর প্রত্যুৎত্তর পাওয়ার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না এর উত্তর পাওয়া যায় ততক্ষণ এটা চালিয়ে যেতে হবে। দিনের বেলায় অবশ্য প্রয়োজনে কোন কোনও ক্ষেত্রে বিপদ সঙ্কেত হিসাবে রঙীন পতাকাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই বিপদবার্তা অপর পক্ষ পেলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জানাবে। এই উত্তর একই ধরণের শব্দ বা আলো দিয়েই পাঠাতে হবে। কিন্তু একটু আলাদাভাবে। যেমন ছ-বার বাঁশির উত্তরে পর পর তিন বার বাঁশী বাজালে বোঝা যাবে অপর পক্ষ বিপদবার্তা পেয়েছে এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করতে আসছে। এটিও এক মিনিট অন্তর পর্যায়ক্রমে বাজাতে হবে।

বিপদবার্তা পাঠানোর পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও যদি কোনও উত্তর না আসে, তবে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যদি দীর্ঘ সময় কোনও দল বা ব্যক্তি বিশেষের সংবাদ না পাওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ খোঁজ খবরের জন্য তৎপর হতে হবে। পাহাড়ী রাস্তায় একটা বিশেষ সময় অন্তর পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বা সঙ্কেত আদান প্রদান করে নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলাই উচিত।

● রুকস্যাক / হ্যাভারস্যাক

দুটোই এক ধরণের জিনিস শুধু আকারে তফাৎ। হ্যাভারস্যাকগুলো ছোট। এগুলো সাধারণ মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকেই ব্যবহার করে। চলতি কথায় এগুলোকে পিট্টু বলে। এগুলিই বড় আর উন্নত প্রকৃতির হলে তাকে রুকস্যাক বলে। যতদিন না রুকস্যাক কেনা যায় ততদিন অবশ্য পিট্টু দিয়েই কাজ চালানো যায়।

রুকস্যাকগুলি বড় এবং ক্যানভাস বা নাইলনের কাপড়ের তৈরী হয়। এবং

পিঠে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে স্ট্রাপ লাগানো থাকে। এগুলি কখনও এ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমসহ-ও হয়।

মূলত একটি বড় পকেট ছাড়াও রুকস্যাকের দুই পাশে ও সামনে কয়েকটি পকেট থাকে যা চেন দিয়ে আটকানো যায়। এছাড়াও ভাল রুকস্যাকে স্লিপিং ব্যাগ ও টেন্ট বয়ে নিয়ে যাবার আলাদা ব্যবস্থা থাকে। কাঁধের ষ্ট্রাপ্ দুটি ছাড়াও রুকস্যাকে কোমরে লাগানোর বেল্ট থাকে। রুকস্যাক বিভিন্ন মাপের হয়। সেই অনুসারে আবার বিভিন্ন নামও আছে এগুলির। যেমন ট্রেকিং, অ্যাসাল্ট, কেলটি, এভারেস্ট ইত্যাদি।

Karrimor সংস্থার তৈরী Jaguar 4, Haston Vallot, Lynx, Feelman, Aiguille, Pinnacle, Annapurna 1—4, এগুলি ছাড়াও বিদেশী নানা কোম্পানীর ভাল ভাল রুকস্যাক পাওয়া যায়। এদেশে দিল্লীর West coast আর Supreme কোম্পানী অগতির গতি। আজকাল আরও এক ধরণের রুকস্যাক পাওয়া যায়। পর্বতারোহণের উপযোগী প্যাকস্যাক নামের এই স্যাকগুলি পিঠের মাল খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকারে ছোট হয়ে যায়।

রুকস্যাকগুলি আড়াআড়ি বেশি বড় না হয়ে লম্বা ধরণের হলে ভাল হয়।

কেনার সময় দেখতে হবে সেগুলি যেন মজবুত, হালকা এবং আড়াআড়ি ভাবে বড় অর্থাৎ চওড়া না হয়ে যেন লম্বা ধরণের হয়। এতে ভারকেন্দ্র পদার্থ বিদ্যার নিয়মে উঁচুতে উঠে যাবে। পিঠে ঝুলে থাকা বোঝার চেয়ে কাঁধের ওপর ওজন বহন করা সহজ। তা ছাড়া এমন রুকস্যাকে বাছতে হবে যা বহন করার সময় আরাম দায়ক হয়। শরীরের সঙ্গে ঠিক মতো ফিট হয় এবং চলার সময় এদিক ওদিক না দোলে। এই দুলুনি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ, সাঁকো, দুরন্ত পাহাড়ী নদী, কষ্টকর চড়াই বা উৎরাই এর ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট করে যে কোনও অভিজ্ঞ ট্রেকারকেও চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। রুকস্যাক পিঠে ঝোলে। হাত দুটো খালি থাকার ফলে ছবি তোলা, ছোটখাট ক্লাইম্বিং, নদী অতিক্রমের সময় হাত দিয়ে অপর সতীর্থকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। কাজেই রুকস্যাকে ত্রুটি শুধু মাত্র ট্রেকারের বহনের অসুবিধাই নয়, বিপদও সৃষ্টি করতে পারে।

● স্লিপিং ব্যাগ ও ম্যাট্রেস

স্লিপিং ব্যাগ ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। এগুলি ওজনে হালকা। সহজে বহন করা যায়। ট্রেকারদের নিজস্ব স্লিপিং ব্যাগ থাকলে ভাল, নইলে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ভাড়া করেও নেওয়া চলে।

স্লিপিং ব্যাগ বিভিন্ন ধরণের পাওয়া যায়।

● **পালকের তৈরী ঃ** এগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। অধিক উচ্চতায় পর্বতারোহণ ও ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় অনেকেরই সামর্থের বাইরে।

● **অ্যাক্রালিক ফাইবারের তৈরী স্লিপিং ব্যাগ ঃ** মোটামুটি হাই অলটিচিউড ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে এগুলি দিয়ে কাজ চলে যায়।

● **পালক ও অ্যাক্রালিক ফাইবারের মিশ্রিত স্লিপিং ব্যাগ ঃ** এগুলিও ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে উপযোগী।

স্লিপিং ব্যাগগুলির কভার সাধারণত নাইলনের কাপড়ে তৈরী হয়। আজকাল আরও উন্নত ধরণের কাপড়ে তৈরী হচ্ছে। Phoenix, Karrimor, Moac, Field & Trek, Millet, Lowe এ সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর স্লিপিং ব্যাগ উন্নত মানের। তবে এ দেশে দিল্লীর দুটি প্রস্তুত কারক Supreme আর West Coast-এর ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

ক) স্লিপিং ব্যাগ গুলি যথা সম্ভব শুকনো অবস্থায় রাখতে হবে।

খ) একটি অতিরিক্ত লাইনিং-এর ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এতে স্লিপিং ব্যাগ কম ময়লা হবে।

গ) স্লিপিং ব্যাগ ভিজে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ভিতরের পালকগুলি বেশি সময় ভিজে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। চেনগুলি যথাযথ ভাবে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত মোম ব্যবহার করলে এগুলি সহজে নষ্ট হয় না।

ঘ) স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে ধূমপান উচিত নয়। জ্বলন্ত মোম বাতি, যে কোনও ধরনের আগুনের কাছ থেকে স্লিপিং ব্যাগকে দূরে রাখতে হবে।

● **ম্যাট্রেস ঃ** পাহাড়ে, মাটিতে শুয়ে থাকা কখনই উচিত নয়। আপাত শুকনো মনে হলেও মাটির থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা লাগিয়ে দিতে পারে। কাপড়ের শতরঞ্চিগুলিও নির্ভরযোগ্য নয়। এই কারণে এয়ার ম্যাট্রেস বা হার্ডফোম রাবার ম্যাট্রেস ব্যবহার করা উচিত। আজকাল উন্নতমানের হার্ডফোম রাবার ম্যাট্রেস পাওয়া যায়। এগুলি হালকা সহজেই গুটিয়ে নিয়ে রুকস্যাকের ওপর বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

এয়ার ম্যাট্রেসগুলি বরফের ওপর শোওয়ার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। এগুলি মেঝে থেকে অন্ততঃ ইঞ্চি তিনেক উঁচু হওয়ায় ঠান্ডার স্পর্শ থেকে বাঁচা যায়। তবে এগুলি নানা কারণে ফুটো হয়ে হাওয়া বের হয়ে যায়। এই বিপত্তি থেকে রক্ষার জন্য পাংচার সারানোর সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।

● **তাঁবু বা টেণ্ট ঃ** হিমালয়ে লো-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে সঙ্গে তাঁবু বা টেণ্ট না থাকলেও চলে। তবে তা সেট-প্যাটার্ণ ট্রেকিং-এর সময়।

লো-অলটিচিউড ট্রেকিং গুলি হিমালয়ের যে উচ্চতায় হয় সেখানে পথে জন বসতি ও গ্রাম পাওয়া যায়। পরিচিত বা সেট-প্যাটার্ণ রুটে সরকারী রেষ্ট হাউস ট্যুরিষ্ট লজ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া প্রয়োজনবোধে স্থানীয় স্কুল বাড়ি, ইত্যাদিতে এবং গ্রাম-বাসীদের বাড়িতেও রাত কাটান যায়। এর ব্যবস্থা গাইড বা পোর্টাররাই করে দেয়। গ্রামীন হিমালয়ের সহজ সরল মানুষেরা আজও অতিথিপরায়ণ। তবে নিতান্ত বিপদে পড়লে এবং আর কোনও উপায় না থাকলে তবেই ট্রেকারদের গ্রামবাসীদের বাড়িতে থাকার সুযোগ নেওয়া উচিত, এবং সে ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে অবশ্যই ভব্য ও সভ্য আচরণ করতে হবে।

হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে পরিচিত বা সেট-প্যাটার্ণ রুটে একটা বিশেষ উচ্চতা পর্যন্ত প্রথম দিকে রেষ্ট হাউস ইত্যাদি পাওয়া যায়, তার উপরের জায়গা গুলিতে মেষ পালকদের ঝোপড়ি বা অস্থায়ী আস্তানা এবং গুহা মিলতে পারে। কিন্তু সেট-প্যাটার্ণের বাইরের রুট অর্থাৎ যদি অপরিচিত বা নতুন কোনও রুটে ট্রেকিং হয় তবে সবই অনিশ্চিত। তা ছাড়া হাই অলটিচিউডে যে কোনও মুহূর্তে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম, সেই বিশেষ জায়গাতেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়ে অপেক্ষা করা। কিন্তু আবহাওয়া যদি বিকেলের যথেষ্ট আগে পরিষ্কার না হয় তবে সেখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। বাতাস, বৃষ্টি, তুষারপাত ও প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই সব ক্ষেত্রে সঙ্গে তাঁবু না রাখা আত্মহত্যার সামিল।

তাঁবু বা টেন্ট বলতে আমরা যে মোটা ক্যানভাসের তাঁবু বুঝি তা ট্রেকিং -এর ক্ষেত্রে অচল। এগুলি সাধারণত খুব বড় আকারের এবং বেশি ওজনের হয়। এই বোঝা ঘাড়ে করে পাহাড়ী রাস্তায় চলা অসম্ভব। ট্রেকিং-এর জন্য হালকা, ভাল জল-নিরোধক কাপড়ের তাঁবু পাওয়া যায়। এর সঙ্গে মাটিতে পাতার জন্য গ্রাউন্ড শীট্ (প্লাস্টিকে তৈরী) ও হালকা অ্যালুমিনিয়ামের পোল থাকে। পোল গুলি ভাঁজ করা যায়, এ ছাড়া এগুলি খাটানোর জন্য মজবুত দড়ি ও গোঁজ থাকে। গোঁজ বা পেগ্ গুলি মাটিতে সহজে পুঁতে রাখা ও তুলে নেওয়া যায়। টেন্টটিও সহজেই খুলে ভাঁজ করে নেওয়া চলে। হালকা হওয়ার জন্য এগুলি সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। খুব ঠান্ডা আবহাওয়া ও অতি-উচ্চতার জন্য আরও হালকা ধরণের নাইলনের জল ও বায়ু-নিরোধক তাঁবু পাওয়া যায়। সাধারণত এক থেকে পাঁচ কেজির মধ্যে এগুলির ওজন। দৈর্ঘ্য অনুসারে দু জন, চার জন বা ছ-জনের জন্য এসব তাঁবু হয়। এগুলিও অংশে অংশে ভাগ করা যায়। প্রয়োজনে একজন তাঁবু ও অন্য কেউ পোল গুলি বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং-এ তাঁবু অবশ্যই চাই। তবে ভাল আবহাওয়ায়

পলিথিনের শীট তাঁবু হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে থাকে। এতে কাজ হয়তো চলে যায় কিন্তু ঝুঁকি থেকেই যায়। তাঁবু ব্যবহারের সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে।

ক) নোংরা বা কাদা সমেত জুতো পরে তাঁবুর মধ্যে যাওয়া উচিত নয়।

খ) তাঁবুর মধ্যে কোন অবস্থাতেই মোমবাতি জ্বালানো বা ধূমপান করা উচিত নয়। সহজদাহ্য তাঁবুর কাপড়ে এর ফলে যে কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে যেতে পারে।

গ) তাঁবুর মধ্যে রান্না করা উচিত নয়।

ঘ) তাঁবু গুটিয়ে ফেলার আগে, ভিজে অবস্থায় থাকলে তা যথাযথ ভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তাঁবুর পোল এবং পেগ গুলি সব সময় আলাদা ভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে। অন্যথায় এগুলির তীক্ষ্ন প্রান্ত তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে দিতে পারে।

● ট্রেকিং-এর খাবার দাবার

ট্রেকিং-এর সময় কী খেতে হবে তা একটা গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার।

আগেকার দিনে তীর্থ যাত্রায় পুঁটলি করে চিঁড়ে গুড় বেঁধে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। এখনও হিমালয় যাত্রায় ট্রেকারদের প্রায় সেই রকম ব্যবস্থাই করতে হয়। সমস্যাটা একই রকম। তবে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে। ঠিক চিঁড়ে গুড় না হলেও খাবার দাবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিদিন আমরা বাড়িতে যে ধরণের খাবার খেতে অভ্যস্ত ট্রেকিং-এর সময় তা মিলবে না এবং ট্রেকারদের মানসিক ভাবে এ বিষয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তবে একথা ঠিক যে লক্ষ্য রাখতে হবে খাবার দাবার যা-ই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন তা যেন স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর হয়। এবং এমন খাবার বাছতে হবে তা যা হালকা ও সহজে বহনযোগ্য হয়। এ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই টিন জাত খাবার, ছাতু, চাউ, আমসত্ব, ছোলা, চিঁড়ে ভাজা, কর্ণ-ফ্লেক্স এবং সহজে রান্না করে খাওয়া যায় এমন খাবার, যেমন খিচুড়ি, আলু, পিয়াঁজ ডিম ইত্যাদির কথা মনে আসে।

তাজা শাক সব্জি লোকালয় গুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ট্রেকিং-এর সময় প্রায় সব ক্ষেত্রেই পথের শেষ গ্রামটি ছাড়িয়েও অনেক দূর চলে যেতে হয়। তাই রাস্তায় যতদূর পর্যন্ত এসব পাওয়া যাবে ততদূর পর্যন্ত এগুলি খাদ্য তালিকায় রাখা চলে। চাল ডাল আটা ইত্যাদি বাড়ি থেকে বয়ে না নিয়ে গেলেও চলে। এসব পথের শেষ শহর বা গ্রাম থেকে কিনে নেওয়া যায়।

বইবার সুবিধার জন্য কিছু কিছু উপায় নিজেরাই বের করে নেওয়া যায়।

যেমন চায়ের পাতার সঙ্গে আগেই গুঁড়ো দুধ ও চিনি মিশিয়ে এক সঙ্গে রেখে দেওয়া চলে। ইনষ্টাণ্ট কফি সঙ্গে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি তা তৈরী করা যায়। খিচুড়ির জন্য চাল ও ডালের সঙ্গে আগেই হলুদ ইত্যাদি মশলা মাখিয়ে রাখা চলে।

উচ্চতার জন্য অনেক সময় খাওয়ার রুচি চলে যায়। এই ক্ষেত্রে জিরে, তেজপাতা, গরম মশলা, এগুলি ভাল করে কড়াইতে ভেজে নিতে হবে। পরে গুঁড়ো করে এবং কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে কৌটোতে ভরে রাখলে, রান্না করা খাবারে এই মশলা মিশিয়ে নিলে খেতে ভাল লাগবে।

খাবারের হিসাব করার সময় মনে রাখতে হবে প্রতিদিন জন-প্রতি প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ গ্রাম খাবার লাগে।

রান্নার জন্য কিছু তৈজস পত্র লাগেই। খুব সাধারণ এবং বলতে গেলে মাপা আয়তনের এবং সীমিত সংখ্যক বাসন-পত্র নিয়ে যেতে হবে। অনাবশ্যক বাসন পত্র বোঝা বাড়ায়। লোক সংখ্যা অনুসারে মাপ বিচার করে প্রেসার কুকার রাখা সুবিধে জনক। এ ছাড়া আছে প্রেসার ষ্টোভ। যতদূর পর্যন্ত গ্রাম আছে জ্বালানীর অভাব নেই। উঁচু চারণভূমিতে কিছু কিছু কাঠ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নীতিগত ভাবে ট্রেকারদের কোনও অবস্থাতেই কাঠের ভরসায় না থেকে অরণ্য সম্পদ রক্ষার চেতনা নিয়ে, ছোট দলের ক্ষেত্রে দিন প্রতি অন্তত দু-লিটার হিসাবে কেরোসিন নিয়ে যাওয়া উচিত।

ট্রেকিং-এর রুটে কোথাও বাসন পত্র ষ্টোভ ইত্যাদি ভাড়া বা কিনতে পাওয়া যাবে না।

খাবারের কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাকিং এর প্রশ্নও আসে। সম্ভব হলে প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুসারে খাবারের ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেট করা যায়। এক্ষেত্রে ট্রেকিং-এ যাবার আগেই আগামী দিনের মেনু অর্থাৎ কোন দিন কী খাওয়া হবে তা আগেই ঠিক করতে হবে।

খাবার প্যাকিং এর সময় প্রতিক্ষেত্রে দুটো করে পলিথিন প্যাকেট রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে একটি প্যাকেটে খাবার যথেষ্ট জায়গা রেখে ভরে তা আবার দ্বিতীয় একটি পলিথিন প্যাকেটে ভরতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমটি ফেটে গেলেও দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত সুরক্ষার কাজ করবে। জল বা বৃষ্টিতে ভিজে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

একটি ১০ ফুট × ১০ ফুট মোটা পলিথিন শীট্ যার চারদিকে আইলেট লাগানো, সঙ্গে নিতে হবে। এটি তাঁবু বা গুহাতে থাকার সময় রাত্রে খাবার বা জিনিস পত্র ঢেকে রাখার কাজে লাগবে। বৃষ্টি, তুষারপাত বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর উৎপাত সব সময় হতেই পারে। তা ছাড়া এই পলিথিন শীট তাঁবুতে থাকার দিনগুলিতে রান্না করার সময় আচ্ছাদন হিসেবেও

ব্যবহার করার কাজে লাগবে।

ট্রেকিং-এর সময় মোটামুটি প্রয়োজন এমন একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হল। তবে অবস্থা ও অর্থের সামর্থ অনুসারে এর তারতম্য ঘটতে পারে। তালিকা অনুসারে এটিকে তিন বেলায় ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন সকালের জল-খাবার, দুপুরের-খাওয়া ও রাতের-খাওয়া। বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন দিনে খাদ্য তালিকার হেরফের করা যায়।

খাদ্য তালিকা

আটা/চাল—২০০ গ্রাম	পাঁপর—১০ গ্রাম
ছাতু—১০০ গ্রাম	মাখন—১০ গ্রাম
চিঁড়ে ভাজা—১০০ গ্রাম	মশলা—৫ গ্রাম
কর্ণ-ফ্লেকস—২৫ গ্রাম	নুন—৫ গ্রাম
সুজি—৫০ গ্রাম	চিনি—৫০ গ্রাম
মুসুর ডাল—২৫ গ্রাম	মিছরী—২৫ গ্রাম
ছোলা ডাল—৫০ গ্রাম	লজেন্স—১০ গ্রাম
মুগ ডাল—৫০ গ্রাম	বাদাম—৫০ গ্রাম
চানাচুর—৫০ গ্রাম	আমসত্ব—১০ গ্রাম
রুটি—১০০ গ্রাম	বিস্কুট—২৫ গ্রাম
শাক সব্জি—১৫০ গ্রাম	চা/কফি – ১০ গ্রাম
আলু—১০০ গ্রাম	দুধ—আধ লিটার
পিঁয়াজ – ৫০ গ্রাম	জ্যাম—১০ গ্রাম
ডিম—২টা	জেলী—১০ গ্রাম
মাংস – ১০০ গ্রাম	আচার—১০ গ্রাম
মাছ—৫০ গ্রাম	পানীয় জল—৩ লিটার
তেল—২৫ গ্রাম	

● ট্রেকিং-এ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র

আজকাল শিক্ষিত মানুষরা প্রায় সকলেই চিকিৎসা সচেতন। কাটা পোড়া, সাধারণ সর্দি-জ্বর এসব সম্পর্কে মোটামুটি চিকিৎসার জ্ঞান আশা করা যায়। এবং প্রায় সকলেই বুঝতে পারেন অবস্থা কখন আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং কখন ডাক্তার দেখান দরকার। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে নিজেদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুসারে অবিবেচকের মতো এণ্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহারের বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হচ্ছে। এই জাতীয় ওষুধ কখনই চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

ট্রেকিং এর দলে একজন ডাক্তার বন্ধু হিসাবে যদি যান তবে খুবই ভাল। কিন্তু কার্যত তা সম্ভব নয়। কিন্তু ফার্স্ট-এইড ট্রেনিং নেওয়া একজন সদস্য থাকা খুব একটা শক্ত কিছু নয়। যারা ট্রেকিং-এ যাবে তারা একটু সচেষ্ট হলেই এই ট্রেনিং নিয়ে নিতে পারে। এবং চেষ্টা করতে হবে সকলেই যাতে এই সামান্য ট্রেনিং নিয়ে নেয়। রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং-এর মত এই ট্রেনিংও যত বেশি সংখ্যক সদস্যের থাকবে ততই ভাল। প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এই ট্রেনিং কারুর না নেওয়া থাকে তবে বাজারে চলতি যে সব বই পাওয়া যায় তার একটি কিনে পড়ে নিলেও কিছুটা কাজ চলে যায়। ভারতীয় সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের "আহতের প্রাথমিক প্রতিবিধান" বইটি সংগ্রহ করতে পারলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে।

কিন্তু ধরা যাক যে দলটি ট্রেকিং-এ যাচ্ছে তাদের এমন অবস্থা হল যে এসব কিছুই সম্ভব হল না। তাহলে কি কর্তব্য? এ রকম অবস্থায় প্রথমেই একজন পরিচিত ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে সমস্যা জানিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো কিছু ওষুধের নাম এবং তা কখন কোন অবস্থায় কী ভাবে খাওয়াতে বা ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিতে হবে, এবং যথাযথ ভাবে নোট বইতে লিখে রাখতে হবে। যে সমস্ত সাধারণ শারীরিক অসুবিধা পাহাড়ে দেখা দেয় তা প্রধানত অত্যধিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, অনভ্যস্ত পরিবেশ ও খাওয়া দাওয়ার কারণে। এর মধ্যে মাথা ধরা, গা-গুলানো, ঝিমুনি, বমি, আমাশয়, পেটখারাপ, জ্বর, গলা ব্যথা, ঠাণ্ডালাগা, পায়ে ফোস্কা পড়া, পা মচকে যাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া আবার কিছু আছে যেগুলির প্রধান কারণ যথাযথ ভাবে আবহাওয়া খাপ না খাওয়া। এগুলির অধিকাংশই দেখা দেয় দশ হাজার ফুটের ওপর থেকে। সাধারণত এখানে বৃক্ষসীমা শেষ হয়ে যায় এবং বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সাধারণত ওষুধ কাজ করে না। এবং নিম্ন উচ্চতায় নেমে এলেই শারীরিক অসুস্থতাগুলি চলে যায়।

ট্রেকিং-এর সময় কখনও খারাপ বা দূষিত জল পান করার জন্যে পেটের গণ্ডগোলে শরীর থেকে জলীয় পদার্থ অত্যধিক বের হয়ে যাওয়ার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফুটানো গরম জল ইলেকটোরাল পাউডার মিশিয়ে জলের বোতলে ভরে রাখলে এবং সারাদিন ধরে তা পান করলে এই বিপত্তি এড়ান যায়। জল পানের সময় বিশেষ সাবধানতার কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। কোনও সময়ই ঝর্ণা বা নদীর জল বিশেষ করে উপরে যদি জন বসতি থাকে তবে তা পান করার আগে অতিরিক্ত সাবধানতা অবশ্যই নিতে হবে। এবং এই জল কোন অবস্থাতেই হ্যালোজেন জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে পরিশুদ্ধ না করে পান করা উচিত নয়।

ট্রেকিং-এর সময় প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ

ঔষধের নাম ঃ	রোগের নাম ঃ
লোমোটিল/ক্লোরোস্ট্রেপ	পেট খারাপ
এন্ট্রোস্টেপ	আমাশয়
এনজাইম	হজমের গোলমাল
মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া/ডালকুলাক্স	কোষ্ঠ বদ্ধতা
এণ্টাসিড ট্যাবলেট	অম্বল
এভোমিন/সিকুইল	বমি
আভিল/ফরিস্টল	এলার্জি
ক্রোসিন	জ্বর
ডেকোডিন/কাফ মিক্সার	কাশি/গলায় ব্যথা
ডেক্সট্রোস ট্যাবলেট	ক্লান্তি
এণ্টিসেপটিক জাতীয় মলম- ফুরাসিন/সোফরামাইসিন	সাধারণ ঘা, পোকামাকড়ের কামড় ইত্যাদির জন্য,
মারকুইরোক্রোম লোশন	কাটা/ছড়ে যাওয়া
বার্নল	পোড়া ঘা
সুগানরিল	হঠাৎ আঘাতের ব্যথা
টেট্রা-সাইক্লিন/সেপট্রান/এ্যমপিসিলিন/ পেনটিড (ডাক্তার অনুমোদিত)	রোগের আক্রমন প্রতিবিধানের জন্য।
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স	শক্তিদায়ক/রোগের আক্রমন প্রতিবিধানে ব্যবহৃত এ্যাণ্টিবায়োটিকের সঙ্গে খেতে হবে।
ভিটামিন সি	ঠাণ্ডা লাগার জন্য।
ডেটল	জীবানু নাশক
গ্লুকোজ	শক্তি দায়ক
ইলেকটোরাল পাউডার	ডি-হাইড্রেশন প্রতিবিধানের জন্য।
হ্যালোজেন বড়ি	পানীয় জল পরিশোধক।
ব্যাণ্ডএড/তুলো/ব্যাণ্ডেজ/ কাঁচি/ব্লেড ইত্যাদি	কাটা ছেঁড়া এবং নানা রকম দুর্ঘটনায় প্রয়োজনে।

হাই অলটিচিউডে অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সেই কারণে কষ্ট ও অসুবিধা দেখা দেওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিশেষ করে শুয়ে থাকার সময়। এগুলি সম্পর্কে খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। একই উচ্চতায় একটি রাত ঘুমানোর পর সাধারণত এটি কেটে যায়।

এ ছাড়া শুকনো কাশিও দেখা দিতে পারে। এটিও হাই অলটিচিউড্ ট্রেকিং-এর সময় একটি সাধারণ অসুবিধা। এটি শুরু হবার সময় সাধারণ কাশির ওষুধ বা লজেন্স জাতীয় ওষুধ খেলে উপকার পাওয়া যায়। গরম বাষ্পের ভাপ মুখ দিয়ে নিলেও উপকার হয়।

এণ্টিবায়োটিক্স এর প্রয়োগ উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে হওয়া উচিত। এর পরিমাপ ও প্রয়োগও তিনিই ঠিক করে দেবেন। এ ছাড়া ট্রেকিং এ যাওয়ার আগে কলেরা, টাইফয়েড, পীতজ্বর, টিটেনাস ইত্যাদির টিকা নিয়ে নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ট্রেকিং যখন শুরু
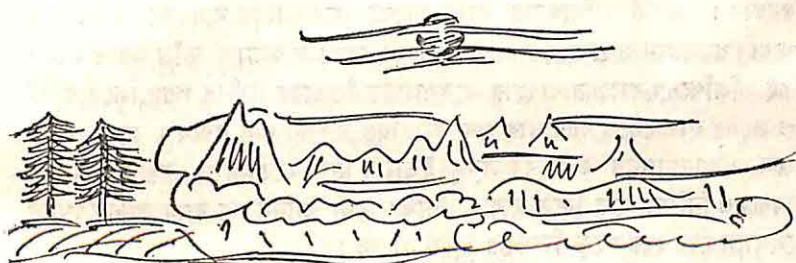
পরিকল্পনা স্থির হয়ে যাবার পর সরঞ্জাম জোগাড়, ট্রেকিং-এর সময় অনুসারে ট্রেনের আসন সংরক্ষণ, বিশেষ বিশেষ জায়গা যেখানে যাওয়ার জন্য অনুমতি লাগে সে সব সংগ্রহ, এবং যাত্রা পথে বাংলো বা রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থার জন্য অনুমতি সংগ্রহ, ইত্যাদি ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর লিডার একটি বিশেষ দিন স্থির করে দলের সকল সদস্যদের নিয়ে একদিন সভা ডাকবে। যাত্রার পূর্বে এটিই শেষ সভা। লিডার ইতিমধ্যে ট্রেকিং রুট সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য, কদিনের ট্রেকিং, কোথায় কদিন থাকা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের পরিস্কার ধারণা দিয়ে দেবে।

● প্যাকিং

এর পরেই আসে জিনিস পত্র **প্যাকিং** এর প্রশ্ন। প্রতিটি ট্রেকিং বা অভিযানে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসলে জিনিস পত্র ঠিকমতো গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেগুলি যথাযথ ভাবে রাস্তায় বহন করা, আর পাহাড়ের নিয়ম কানুন গুলো মেনে সঠিক ভাবে পথ চলাই ট্রেকিং সাফল্যের চাবিকাঠি।

প্যাকিং-এর দুটো পর্যায়। সদস্যদের ● **ব্যক্তিগত জিনিস পত্রের**

প্যাকিং ও ● **দলগত জিনিস পত্রের প্যাকিং**। এই দু ধরণের প্যাকিং-ই যথাযথ ভাবে এবং খুব যত্নের সঙ্গে করতে হবে।

● ব্যক্তিগত জিনিস পত্রের প্যাকিং ঃ

প্রায়ই দেখা যায় নতুন যারা ট্রেকিং-এ যাচ্ছে তারা অতি উৎসাহে বা এক ধরণের মোহে আবিষ্ট হয়ে নিজেদের জিনিস পত্র ঠিক মতো গুছিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে যায়, এবং হিমালয়ের প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে চরম বিপদের মুখে পড়ে। তাই তারা যাতে তাদের ব্যক্তিগত জিনিস পত্র যেমন জামা কাপড়, জুতো স্লিপিং ব্যাগ, ম্যাট্রেস, জলের বোতল ইত্যাদি লিস্ট মিলিয়ে নিয়ে যায় সে বিষয়ে বার বার সাবধান করে দিতে হবে। ট্রেকারদের ব্যক্তিগত জিনিস পত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য রুকস্যাক বা পিট্টু দরকার। একটি পলিথিনের ব্যাগ আগেই রুকস্যাকের মধ্যে ভরে নিয়ে তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রুকস্যাক ভর্ত্তি করতে হবে। এই পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার রুকস্যাকের ভিতরের জিনিস পত্রগুলিকে বৃষ্টি ও জলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা দান করবে। রুকস্যাকের চেন ও আটকানোর জন্য বক্‌ল্‌স্‌ ইত্যাদি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। যাতে অযথা জিনিস পত্র যখন তখন যেখানে সেখানে বের হয়ে পড়ে বিপত্তির সৃষ্টি না হয়।

রুকস্যাক ভর্ত্তি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জিনিসগুলো সুরক্ষিত এবং যথাযথ ভাবে থাকে এবং প্রয়োজনে সহজে বের করা যায়। বহনকারীর সুবিধা হয় এমনভাবে জিনিস ভর্ত্তি করা উচিত।

স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস স্যাকের সবচেয়ে তলায় রাখতে হবে। ফোমের তৈরী ম্যাট্রেস রুকস্যাকের মাথায় নেওয়া চলে।

সাধারণ জামা কাপড় ও অন্যান্য জিনিস যা পথ চলার সময় কাজে লাগেনা তা স্যাকের ভিতরে ধারে ধারে রাখা চলে।

জিনিস পত্রগুলি আলাদা আলাদা পলিথিনের প্যাকেটে পুরে এমন ভাবে রাখতে হবে যেন সব কিছু ছত্রাকার হয়ে না থাকে। এবং প্রয়োজনের সময় সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ক্যামেরা, বাইনাকুলার রুকস্যাকের মধ্যে রাখা চলবে না। গলায় ঝুলিয়ে নিতে হবে। জলের বোতলও বাইরে রাখতে হবে।

ফার্ষ্ট-এইড বক্স, দেশলাই, ম্যাপ, কম্পাস, এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে সেগুলি হাতের কাছে থাকে এবং প্রয়োজনে সহজেই বের করা যায়।

অন্য জিনিসপত্র যেমন স্টোভ, তাঁবু, তাঁবুর পোল এসব যেন রুকস্যাকের ওপর দিকে থাকে। লম্বা জিনিসপত্রগুলি আড়াআড়ি ভাবে না রেখে লম্বা

লম্বি রাখা উচিত। এতে প্রথমত ওগুলি বইবার সুবিধা হবে, দ্বিতীয়ত সরু পথ দিয়ে চলার সময় সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

প্যাকিং-এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে রুক্স্যাকে লাঞ্চ প্যাকেট এবং রাস্তায় হঠাৎ দরকার পড়ে এমন বস্তুগুলি যাতে প্রয়োজনের সময় সহজেই বের করা যায়।

● **দলগত জিনিস পত্রের প্যাকিং** ঃ দলের প্রয়োজনীয় ভারী জিনিস পত্রগুলি ট্রেকারদের মধ্যে সব সময় ভাগ করা যায় না। এজন্য আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন। জিনিস পত্রের মধ্যে পুরো দলের রেশন, ক্যাম্পের জিনিস পত্র, টেণ্ট, রান্নার সরঞ্জাম, জ্বালানী এসবই পড়ে। এসবের জন্য আলাদা আলাদা কাঠের বাক্স রাখার প্রয়োজন। চাল, ডাল, আটা, ছাতু, পিঁয়াজ, আলু এসব প্রথমে বড় পলিথিনের ডবল ব্যাগের মধ্যে ভরে তার পর বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া চলে।

টিনের কণ্টেনারে ভরে রাখা খাবার এবং যে সমস্ত জিনিস সহজে ভেঙে যেতে পারে সেগুলি অবশ্যই মজবুত কাঠের বাক্সে ভরে নিয়ে যাওয়া দরকার। এগুলি বাক্সের ভিতর নড়া চড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত যাতে না হয় তার জন্য খড়ের কুচো ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যাকিং করতে হবে।

কাঠের বাক্স মজবুত ও হালকা হওয়া দরকার। জিনিস পত্র ভরবার পর এগুলির ওজন ২৫ কেজির বেশি হওয়া চলবে না। কারণ একজন পোর্টারের বহন ক্ষমতা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এর সঙ্গে সে তার নিজস্ব জামা কাপড় ও খাবার বইবে।

ঘোড়া ও খচ্চর মাল বহনের জন্য ব্যবস্থা করলে তাদের দেহের দুদিকে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি মাল দেওয়া যায়।

দলে বয়স্ক ও অসুস্থ সদস্যদের জন্যও এই ঘোড়া আপৎকালে ব্যবহার করা চলে।

ব্যাগ ও বাক্সগুলিতে পৃথক পৃথক ভাবে কালি দিয়ে নম্বর লিখে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে একটি লিস্ট রাখতে হবে যাতে বোঝা যায় কোন বাক্সে কী আছে। এই লিস্টের তিনটি কপি থাকবে। একটি কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে। একটি দলপতির কাছে। অপরটি দলের মূল ফাইলে থাকবে।

অনেক সময় খাওয়ার মেনু ও রেশন ট্রেকিং এর দিন অনুসারে আগের থেকেই স্থির করা হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী প্রতিদিনের খাবার আলাদা বাক্সে আগেই প্যাকিং করা যায়। দিনের দিন সেই বাক্স খুলে নিলেই চলে। কাঠের বাক্স একবার খুললে দ্বিতীয়বার তা আবার প্যাক করার সময় অনেক সময় অসুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে সেই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওরা যায়। দল বড় হলে এই ধরণের ব্যবস্থা সুবিধে জনক।

পোর্টার বা মালবাহক

পাহাড়ে যেতে হলে মাল বইতে হবে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি প্রতিটি ট্রেকারের থাকা উচিত। একজন ভাল ট্রেকারকে একজন ভাল মালবাহক হতেই হবে। বিদেশের ট্রেকারদের এই গুনটি প্রচণ্ড ভাবে আছে। বিদেশে পোর্টার পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কাজেই যার মাল বইবার ক্ষমতা নেই তাকে ট্রেকিং এর থেকে দূরে থাকতে হয়।

আমাদের দেশ এবং এশিয়ার দেশগুলিতে মালবাহক পাওয়া এখন পর্যন্ত খুবই সহজ। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে পোর্টারদের এই সহজ প্রাপ্যতা কমে আসবে। বলতে কি ইতিমধ্যেই কমে এসেছে। এবং পোর্টারদের মজুরীও আনুপাতিক হারে বেড়ে গেছে। কাজেই এদেশেও নিজেদের মাল নিজেদের বইবার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এছাড়াও খুব সামান্য কারণে অনেক সময় পোর্টাররা অভিযান ছেড়ে চলে যায়। এবং এই ক্ষেত্রে সদস্যরা যদি এই ব্যাপারকে মোকাবিলা করার সামর্থ না রাখে তবেই বিপদ।

বোঝা বইবার জন্য যতটা না শক্তির প্রয়োজন হয় তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন অভ্যাস আর কিছু কৌশলের। কাজেই ট্রেকিং-এ যাওয়ার আগে এই বিষয়ে যদি অভ্যাস করে নেওয়া যায় তবে কাজটা অনেক সোজা হয়ে যায়।

হঠাৎ বৃষ্টি, তুষারপাত, ধস, অন্ধকার, বরফ ইত্যাদি নানা কারণে কোথাও অত্যাবশ্যক রাত্রি কাটানোর সময় পিঠের রুকস্যাকে পর্যাপ্ত খাবার আর তাঁবু থাকলে দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। কাজেই রুকস্যাকটিকে বোঝা না ভেবে বন্ধু হিসেবে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সাধারণত একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে তার দেহের ওজনের ৪০% ওজন বহন করা সম্ভব। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসে মানুষ এর চেয়েও বেশি ওজন বইতে পারে। দেখা গেছে নেপালী বা শেরপারা তাদের নিজেদের ওজনের চেয়েও বেশি ওজন বইতে পারে। এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে ঃ—

ক) বেশি ওজন বইতে গেলে ওজনটিকে ঘাড়ের কাছকাছি রাখতে হবে। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের যত বেশি ওপরে রাখা যায় ততই সুবিধের।

খ) রুকস্যাকের কাঁধের ষ্ট্রাপের সাহায্যে একজন সুস্থ ট্রেকার ২৫ কেজির মতো মাল বইতে পারে।

গ) কোমরের ষ্ট্রাপটি বেঁধে নিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে চললে আরও বেশি ওজন নেওয়া যাবে।

ঘ) ওজন যদি আরও বেশি হয় তবে মাথার সঙ্গে ষ্ট্রাপে মাল বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর বিশ্রাম নেওয়া অবশ্যই

প্রয়োজন।

ঙ) বেশি ওজন নিয়ে হাঁটার সময় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গিরিশিরা, কাঠের গুঁড়ির সেতু, সরু পথ, ঝর্ণা বা নদীর কাছের পাহাড়ী ঢাল, খাড়াই পথ ইত্যাদি পার হতে হবে। কারণ সামান্য অসাবধানতায় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বাহক পড়ে যেতে পারে।

চ) লক্ষ্য রাখতে হবে রুকস্যাক যেন কোন অবস্থাতেই আলগা হয়ে এদিক ওদিক না দোলে কারণ এতেও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বাহক পড়ে যেতে পারে।

তবুও পোর্টার লাগেই, এবং জোগাড়ও করতে হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোর্টারের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা সম্ভব। বিশেষ করে সেট-প্যাটার্ন বা পরিচিত ট্রেকিং-রুটে যারা গাইডের কাজ করে তারাই পোর্টারের ব্যবস্থা করে থাকে। সময় থাকতে এক্ষেত্রে চিঠি লিখে কত জনের দল, কোথায় যাওয়া হবে, কতদিনের ট্রেকিং এবং কত জন পোর্টার দরকার এসব জানাতে হয়। এছাড়া পরিচিত রুটে ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে হঠাৎ গিয়ে পড়লেও পোর্টার পেতে অসুবিধা হয় না। পোর্টার সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থার সাহায্যও নেওয়া যায়।

ট্রেকিং রুটগুলিতে সাধারণত মাল বাহক বা গাইডরা যে মজুরী চায় যতদূর সম্ভব দর কষাকষি না করে তাতেই রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। তবে বাজার দরের চেয়ে বেশি দাবী এদের বড় একটা থাকে না। তাছাড়া প্রথম থেকেই সম্পর্ক ভাল থাকলে দুর্গম পথে এদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়।

কিন্তু স্বল্প পরিচিত বা নতুন রুটে ট্রেকিং-এর সময় মালবাহক জোগাড় করা সমস্যা। এর কারণ সাধারণত সে সব জায়গায় লোকেরা এ জাতীয় কাজে অভ্যস্ত থাকে না, বা কোন দিন এ সব কাজ করেনি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাসপথের যেখানে শেষ সেই গ্রামের প্রধান বা মুখিয়া, স্কুলের মাস্টারমশাই, দোকানদার বা বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সমস্যার সমাধান হবে। তবে এদের সঙ্গে কথা বলার সময় কোন ক্ষেত্রেই মাল-বাহকের মজুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে দরকষাকষি বা কম মজুরী দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এবং মাল বাহক পাওয়া গেলে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে ঃ

ক) মাল বাহকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং দলের সদস্যস্বরূপ ব্যবহার করা।

খ) খাওয়া দাওয়া বা থাকার ব্যাপারে সমান সুবিধা বণ্টন।

গ) মালবাহকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করা, অকারণে সন্দেহ না করা, এবং আদেশ বা ধমকের সুর কথা না বলা।

ঘ) কোনও মালবাহক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমত সাহায্য ও সহায়তা করা।

ঙ) কোনও মালবাহকের গ্রামের মধ্য দিয়ে যদি যাওয়ার পথ হয় তবে তারা অনুরোধ করলে তাদের বাড়িতে যাওয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস বা আচরণ বিধির প্রতি সম্মান দেখান উচিত। বাড়ির বৃদ্ধ ও মেয়েদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য।

চ) গ্রামের মন্দির দেবস্থান বা অন্য কোন দেব-দেবীর প্রতি অভক্তি বা অসম্মান প্রদর্শন করা উচিত নয়।

ছ) ট্রেকিং-এর শেষ দিনটিতেও মালবাহকদের সঙ্গে প্রথম দিনের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা উচিত।

● প্রতিদিনের যাত্রা

বেসটাউন থেকে বাস রাস্তার শেষ পর্যন্ত আসার পর মাল বাহক, গাইড জোগাড় এবং যদি শেষ পর্যায়ের খাবার দাবার (চাল, আটা ইত্যাদি) কিছু কেনার থাকে তবে তা কিনে নেওয়ার পরই কিন্তু মূল ট্রেকিং এর পূর্ব পর্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এসব জায়গায় সম্ভব হলে একটা বা দুটো দিন কাটানো উচিত। অন্তত একটা দিন তো অবশ্যই। কারণ যারা সমুদ্র তীরবর্ত্তী জায়গা বা সমতল থেকে পাহাড়ে আসছে এই পর্যায়ে তাদের আবহাওয়া খাপ-খাইয়ে নিতে হয়। এই আবহাওয়া খাপ-খাওয়ানো বা অ্যাক্লেমেটাইজেশন ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় বাঁচানোর জন্য এটাকে অবহেলা করা একেবারেই অনুচিত।

এর পরেই শুরু হচ্ছে আসল ট্রেকিং। আগেই বলা হয়েছে ট্রেকিং এর পুরো রুট সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য জোগাড় করে রাখতে হবে। এবং এই রুট যেন সকলেরই মুখস্ত হয়ে যায়।

প্রতিদিন ট্রেকিং এর দূরত্ব আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে নিয়ে যাত্রার আগের দিন রাত্রে দলপতি বা লিডার দলের সদস্যদের কাছে পরের দিনের যাত্রা পথ সম্পর্কে পরিস্কার একটা ধারনা দিতে চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে রাস্তায় কতটা চড়াই বা উৎরাই আছে এবং কোন কোন পর্যায়ে, পথে পাহাড়ী নদী আছে কি না, থাকলে তা পার হওয়া প্রয়োজন কি না, স্টোন ফলিং জোন বা ঐ ধরণের কোন বিপজ্জনক জায়গা আছে কি না, গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কতটা পথ পার হতে হবে ইত্যাদি বিষয় ম্যাপের সাহায্যে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবে। এবং কোথায় কী ভাবে কী করতে হবে লিডার তাও স্পষ্ট করে বলে দেবে। প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে যে স্কেচ ম্যাপ থাকবে তাতে এসব বিষয় উল্লেখ করে দিতে হবে।

এই আলোচনায় প্রতিটি সদস্যই পরের দিনের সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে জেনে নিতে পারবে।

সমস্ত ক্ষেত্রে পাহাড়ী রাস্তার সর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত রুট পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় অত্যন্ত কঠিন রাস্তা অতিক্রম জনিত ক্লান্তিতে সদস্যেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে।

রাস্তার প্রতিটি বিপজ্জনক ও কঠিন অংশ পার হবার আগে ও পরে দলের সকল সদস্য এক জায়গায় সমবেত হবে।

দলের সকলে একত্র হয়ে পথ হাঁটাই পাহাড়ে নিয়ম। অন্তত সবাই যাতে সবাইকে চোখে দেখতে পায় এমন দূরত্ব রেখে হাঁটা উচিত।

প্রতিদিনের পথ হাঁটার যে সময় নির্দ্ধারণ করা হবে তার থেকে অন্তত দু-তিন ঘণ্টা বেশী সময় সব সময় হাতে রাখতে হবে। কারণ পাহাড়ী রাস্তায় বৃষ্টি, তুষারপাত, কুয়াশা, হঠাৎ অন্ধকারে পথ ঢেকে যাওয়া এসব যে কোনও মুহূর্তেই হতে পারে

দলপতি প্রতিটি সদস্যের শারীরিক সামর্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকবে। এবং সেই বিচারে দলের সবচেয়ে কম সামর্থের সদস্যটির কথা মনে রেখে প্রতিদিনের রুট এবং কতটা পথ হাঁটতে হবে তা স্থির করবে। সমস্ত জিনিস পত্রের ওজন এবং সদস্যদের ওপর যে ভার বণ্টন করা হয়েছে সেসম্পর্কেও দলপতির পরিস্কার ধারণা থাকবে।

দুপুরে খাওয়ার লাঞ্চ প্যাকেট যাত্রা শুরুর আগে সরবরাহ করতে হবে।

অতিরিক্ত ভার, রাস্তার দুর্গমতা, আবহাওয়ার অবনতি এবং জরুরী অবস্থা গুলি বিচার বিবেচনা করে দলপতি সব সময় অতিরিক্ত সময় প্রতিদিনের যাত্রায় সংযোজন করবে।

দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে দলপতি দলটিকে ছোট ছোট কয়েকটি দলে ভাগ করে নেবে। এবং প্রতিদলে সমভাবে কিছু দুর্বল ও শক্তিমান সদস্য রাখবে।

দলপতির নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি দলকে তাদের সকল সদস্যকে এক সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

রাস্তার মাঝে মাঝে যে হল্ট বা থামার জায়গা গুলো থাকবে তাতে প্রতিটি দল আলাদা আলাদা ভাবে তাদের সকল সদস্যদের নিয়ে একত্রিত হবে।

ট্রেকিং-এর সাফল্য দলপতির সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

দলের অসুস্থ ও দুর্বলতম সদস্যের বোঝা অন্যেরা যথা সম্ভব বইবার ব্যাপারে এবং মানসিক শক্তি জোগানোর ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা অনেক সময় তাদের খেলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায়। ট্রেকিংও সেই রকম। পাহাড়ে হাঁটাও একটা শিল্প। যে সমস্ত ট্রেকাররা এটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, প্রচণ্ড চড়াই আর কষ্টসাধ্য পাহাড়ী পথও তাদের কাছে রমনীয় হয়ে ওঠে।

পাহাড় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তখনই যখন একজন ট্রেকারের কাছে নিশ্চিন্ত হওয়ার মত উন্নত মানের সরঞ্জাম, খাবার, জামা কাপড়, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, ম্যাপ আর কম্পাসটি সঙ্গে থাকে।

কোন সময়ই একজন ট্রেকার তার নিজের শরীরের সামর্থ সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করবে না। অসুস্থতা, খারাপ আবহাওয়া, দুর্ঘটনা এগুলি কখনও নিয়ম মেনে চলেনা। হিমালয়কে অবহেলা নয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত বিপজ্জক পথ বা খারাপ আবহাওয়ার কবলে পড়লে প্রস্তাবিত রুটের পরিবর্ত্তন বা পুরো যাত্রাটিকেই বাতিল করার বিষয়ে কখনই দ্বিধা করা উচিত নয়।

এসমস্ত কথা মনে রাখলে প্রতিটি ট্রেকিংই রমনীয় ও আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে।

● দলপতির কাজ ও দায়িত্ব

উপরে দলপতির কাজ সম্পর্কে কিছু কথা বলা হলেও এ বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ট্রেকিং বা পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে দলপতির কাজটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে আসার যুক্তি নেই। ট্রেকিং-এর পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পর্বতারোহণ সম্পর্কে মোটামুটি ধ্যান ধারণা থাকলে কাজটি তেমন কিছু কঠিন বলে মনে হবার কথা নয়। কিন্তু যে দলটি প্রথম ট্রেকিং-এ যাচ্ছে এবং দলে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেউ-ই নেই সেখানে দলপতিকে সতর্ক হতে হবে এবং কিছু বিষয় জেনে নিতে হবে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। জীবনের বহু সমস্যায় মানুষকে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হয়। সাহস করে কাজে নামাটাই কথা। দলপতির কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বিষয় নিচে উল্লেখ করা হল।

১) খুব যত্নের সঙ্গে পর্বতারোহণ বা ট্রেকিং সম্পর্কে একটি ধারণা সংগ্রহের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

২) সম্ভব হলে নিজ দায়িত্বে রকক্লাইম্বিং কোর্সে যোগদান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।

৩) ফার্স্ট-এইড সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সংগ্রহ করতে হবে।

৪) গন্তব্য ট্রেকিং রুটের অবস্থান, ভৌগলিক খুঁটি-নাটি, রাস্তার সম্পূর্ণ

বিবরণ পরিচিতি এবং সেই অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তুগুলির অবস্থান ও পরিচিতি সম্পর্কে দলপতির জ্ঞান থাকবে এবং সদস্যদের এই বিষয়ে অবহিত করবে।

(৫) ট্রেকিং-রুট যে বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে দলপতির ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) ভূ-প্রকৃতি ছাড়া আবহাওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ও তথ্য দলপতি সংগ্রহ করবে এবং এ সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করবে।

(৭) ক্যাম্পিং ও আউটিং-এর সাধারণ নিয়মকানুন সম্পর্কে দলপতির স্বচ্ছ ধারণা থাকবে।

(৮) হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর সময় আবহাওয়া খাপ-খাওয়ানো বা অ্যাক্লেম্যাটাইজেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২৩০০ মি বা ২৫০০ মি উচ্চতায় ওঠার পর দলপতি অবশ্যই সেই বিশেষ অঞ্চলে পুরো দলটিকে বাধ্যতামূলক ভাবে কমপক্ষে দু-দিন অবস্থান করাবে। মনে রাখতে হবে আবহাওয়া খাপ-খাওয়ানোর জন্য যত বেশি সময় নিয়ে পাহাড়ে ওঠা যায় ততই ভাল।

(৯) ট্রেকিং শুরুর আগে দলপতি স্থানীয় থানা, চেকপোস্ট, রেসকিউ পোস্ট বা ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে যোগাযোগ করবে, এবং ট্রেকিং-এর যাবতীয় তথ্য, বিশেষ করে সদস্যদের সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা (সম্ভব হলে ফটোগ্রাফ সহ) এবং যাত্রা পথের সম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রত্যাবর্তনের তারিখ ইত্যাদি জমা দিয়ে যাবে। দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি বিপদে সাহায্য ও সহায়তার জন্য এটি একটি অত্যন্ত জরুরী কাজ।

(১০) যাত্রাপথে গ্রাম ইত্যাদিতে স্থানীয় মুখিয়া, পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদির সঙ্গে দলপতি সংযোগ রক্ষা করে চলবে, এবং সদ্ভাব বজায় রাখবে। চলার পথে উল্লেখযোগ্য কিছু যেমন, জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে যাওয়া পুল, দুর্ঘটনা ইত্যাদি চোখে পড়লে তা পরবর্তী গ্রামে জানিয়ে যাবে।

(১১) প্রতিদিনের যাত্রাপথ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাত্রা শুরুর পূর্ব রাত্রে এবং যাত্রা শুরুর প্রাক্ মুহূর্তে দলপতি সদস্যদের কাছে রুট ম্যাপ-সহ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ভাবে জানিয়ে দেবে। রাস্তায় কোথায় কোথায় চড়াই আছে, নদী বা নালা পার হতে হবে কিনা, পথে রক-ফলিং জোন, ক্রিভার্স জোন, অ্যাভেলান্স জোন কোথায় কোথায় আছে এবং রাস্তায় বিশ্রাম স্থলগুলি কোথায় কোথায় হবে এ সকল তথ্য নির্দেশ করবে। মনে রাখতে হবে পরিচিত বা সেট-প্যাটার্ণ ট্রেকিং রুটে এসব তথ্য সহজলভ্য হলেও অপরিচিত রুটে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। অনেক সময় এই সব রুটে আগে যদি কেউ গিয়ে থাকেন তাঁর কাছে বা অভিজ্ঞ গাইড পাওয়া গেলে এই তথ্য পাওয়া সহজ হতে

পারে। চেষ্টা করতে হবে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(১২) দলের প্রতিটি সদস্য যাতে পাহাড়ের নিয়ম কানুন ও ব্যক্তিগত সুরক্ষার নিয়মগুলি সযত্নে মেনে চলে দলপতি সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

(১৩) অসুস্থ সদস্যদের অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে তাদের নিচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন মতেই বিলম্ব করা চলবে না। সদস্যদের সতর্ক করে দিতে হবে কেউ যেন শারীরিক অসুস্থতাকে কোন ভাবে গোপন না করে।

(১৩) দলের প্রতিটি সদস্যের শারীরিক গঠন, সামর্থ, অবস্থা, মানসিকতা সম্পর্কে দলপতির সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা থাকবে।

(১৪) প্রখর দূরদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব, মানসিক দৃঢ়তা এবং ঠাণ্ডা মাথা ইত্যাদি গুণগুলি দলপতির থাকা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে হুকুম কেউ পছন্দ করে না। তবে দলপতির নির্দেশ মানা উচিত। লোক চরিত্র বোঝা, সহানুভূতি কৌশল ও দূরদৃষ্টি না থাকলে দল চালান কঠিন কাজ।

(১৫) ট্রেকিং কয়েক দিন ধরে চলে। এই দীর্ঘ সময়ে কষ্টকর পথ অতিক্রম এবং বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানের জন্য দলের সদস্যবর্গের নানা কারণে বিভিন্ন রকম ব্যক্তিগত বা দলগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত অভিযোগ বা সমস্যা ঠাণ্ডা মাথায় শোনা এবং সেগুলি সমাধানের দায়িত্ব দলপতির। কোন ক্ষেত্রেই মাথা গরম করা চলবে না। মানসিক ধৈর্য্যই দলপতির একমাত্র সহায় ও সম্পদ।

(১৬) বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময় দলের সবচেয়ে কম শারীরিক শক্তি সম্পন্ন সদস্যকে যাত্রাপথে প্রথম দিকে রাখতে হবে। এর ফলে সকলেই একসঙ্গে যেতে পারে এবং কেউ মনঃক্ষুণ্ণ বা হতাশ হয় না।

(১৭) পাহাড়ে এক সঙ্গে পথ চলা নিয়ম। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে নতুন দলের ক্ষেত্রে প্রায়ই সদস্যদের মধ্যে একটা গ্যাপ বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। দলপতিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই দূরত্ব বা গ্যাপ যেন কখনই খুব বেশি না হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সময় ও রাস্তায় নির্ধারিত বিশ্রাম স্থলগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। নিয়ম করে দিতে হবে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সময়ে এবং বিশ্রাম স্থলগুলিতে সকলেই যাতে একত্রিত হয়। দলপতির এই নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। দলপতি অত্যন্ত সতর্ক থাকবে কোন সদস্যই যাতে দলছাড়া হয়ে না যায়।

(১৮) প্রতিটি বিপজ্জনক স্থান, কষ্টসাধ্য চড়াই, নদী বা নালা অতিক্রমের পর দলের সকল সদস্যকে দলপতি অবশ্যই একত্রিত করবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও অপেক্ষার পর আবার যাত্রা শুরু করবে।

(১৯) সমস্ত রকম বিপদ ও সমস্যায় দলপতিকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

(২০) যে কোনও রকম বিপজ্জনক ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দলের মনোবল ও মানসিকতা উন্নত ও অটুট রাখার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দলপতিকে সক্ষম হতে হবে।

(২১) বিরুদ্ধ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দলপতি দলের অভিজ্ঞ সদস্য, ডেপুটি-লিডার, অভিজ্ঞ গাইড বা পোর্টার, স্থানীয় অভিজ্ঞ জনসাধারণের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

(২২) বিরুদ্ধ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ ধারণা এবং নিজের উপর পূর্ণ আস্থা না থাকলে দলপতি হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। পাহাড়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ চরম বিপদ ডেকে আনার নামান্তর। পর্বতারোহণ বা ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে যত দুর্ঘটনা ঘটে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার অধিকাংশের জন্য দায়ী অজ্ঞতা, ভুল সিদ্ধান্ত, অসতর্কতা এবং হঠকারীতা। পাহাড়কে সব সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

(২৩) অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া, দুর্ঘটনা, এবং আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়া পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অবস্থা বিচার করে রুটের পরিবর্তন বা ট্রেকিং বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলপতি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

ডেপুটি-লিডার বা সহ-দলনেতার কাজ ও দায়িত্ব

দলপতিকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে সহায়তা করাই ডেপুটি-লিডারের মূল কাজ। কাজেই দলপতির কাজ বা দায়িত্বের সঙ্গে ডেপুটি-লিডারের কাজ বা দায়িত্বের বড় একটা হেরফের নেই। তবে মূল দায়িত্ব দলপতির। বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ডেপুটি-লিডারকেই দলের দায়িত্ব নিতে হবে।

সাধারণত ডেপুটি-লিডারের ট্রেকিং চলাকালীন কিছু বিশেষ দায়িত্ব থাকে।

১। দলপতির নজর এড়িয়ে যাওয়া সমস্যা দলপতিকে অবহিত করা এবং সমাধানে সহায়তা করা।

২। পথ চলার সময় ডেপুটি-লিডার সকলের পিছনে পথ চলবে। তার দায়িত্ব সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সদস্যটিকেও ঠিক মতো গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়া। প্রয়োজনে পুরোদলটিকে একত্রিত করা।

৩। পথ চলার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে একজন সদস্যও দল ছাড়া না হয়ে যায়।

৪। লক্ষ্য রাখতে হবে দলের সকলেই পথের প্রতিটি দর্শনীয় বস্তু যাতে উপভোগ করতে পারে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

সদস্যদের দায়িত্ব

(১) দলের প্রতিটি সদস্যের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের দায়বদ্ধতা আছে।

স্বার্থপর ও গুজগুজে স্বভাবের লোক ট্রেকিং-এর দলে না থাকাই ভাল।

(২) পাহাড়ের নিয়ম কানুন স্বেচ্ছায় এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

(৩) দলপতির নির্দেশ ও আদেশ মান্য করে চলতে হবে।

(৪) যাত্রা পথে কারুর পিছনে লাগা, অনাবশ্যক সমালোচনা করা বা কোন সদস্যের প্রতি বিরূপ ব্যবহার করা অনুচিত।

(৫) দলের মধ্যে আলাদা দল পাকানো বা সমস্যা সৃষ্টি করা অনুচিত। পুরোদলটি একটি দল এবং সকলেই সকলের সুখ দুঃখের সাথী এই বোধ নিয়ে পথ চলতে হবে।

(৬) নিজে সহযোগিতা ও সাহায্য পেতে হলে সবার আগে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে।

(৭) ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত বলে কোনও ব্যাপার নেই। একালসেঁড়ে মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

(৮) দলের প্রতিটি আনন্দের মুহূর্ত, বিপদ বা বিরুদ্ধ অবস্থায় সমভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(৯) কোন সময়েই একা পথ চলা উচিত নয়। কারণ হঠাৎ পতন, হারিয়ে যাওয়া বা কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কেউ কোনও খোঁজ পাবে না।

(১০) বাড়াবাড়ি করা বা কৃতিত্ব দেখানোর কোন রকম প্রচেষ্টা করা উচিত নয়।

(১১) যদি যাত্রা পথে কোনও রকম সমস্যা বা সন্দেহের সৃষ্টি হয় তবে দলপতির কাছ থেকে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিস্থিতি অনুসারে দিনের যাত্রার শেষে সন্ধ্যায় আলোচনা করা যেতে পারে।

(১২) অসুস্থতা গোপন করা অনুচিত। অসুস্থতার বিষয় অবিলম্বে দলপতিকে জানাতে হবে। যাতে উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত বোঝা কমানোর ব্যবস্থা নিতে তার পক্ষে সুবিধা হয়।

পাহাড়ে আচরণ বিধি

পাহাড়কে ভালবেসে তার সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে পথ চলাই শেষ কথা নয়। পাহাড়ে যেমন যেতে হবে, তেমনি ফিরেও আসতে হবে সুস্থ দেহে।

পাহাড়কে না জেনে অনেকেই অযথা ভয় পায়। দুর্ঘটনা যে হয় না এমন কথা নয়। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে তার কয়েক-শ গুণ বেশি দুর্ঘটনা প্রতিদিন কলকাতা, দিল্লী, বোম্বের মতো শহরে ঘটে যায়। বহুলোকের মৃত্যু হয়। সেই অনুপাতে পাহাড়ের দুর্ঘটনা কোনও হিসাবের মধ্যেই আসে না। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই, সেগুলির কথা বাদ দিলে পাহাড়ে যে সব বিপদ আপদ ঘটে তার জন্য দায়ী কিন্তু ট্রেকাররা নিজেরাই। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য তৈরী হয়েছে মাউণ্টেন ম্যানার্স বা পাহাড়ের আচরণবিধি।

এই আচরণবিধিগুলি খুবই সহজ সরল কিছু নিয়মকানুন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ট্রেকার বা মাউণ্টেনিয়াররা নিজেরাই সেগুলি তৈরী করেছেন। পাহাড়ের পথে চলার সময় এগুলি অবহেলা বা অবজ্ঞা করলেই বিপদ-আপদ নেমে আসে। তাই নিজেদের স্বার্থেই ট্রেকারদের এই সব নিয়ম কানুনগুলি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে জানতে হবে, বুঝতে হবে, আর এই সহজ ব্যাপার গুলিকেই কঠোরভাবে আইন হিসেবে মেনে নিয়ে চলতে হবে। এই নিয়মগুলির মধ্যে যেমন কী ভাবে পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে হবে তা আছে, তেমনি আছে

সামাজিক এবং পরিবেশ সম্পর্কে ট্রেকারদের অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্য।

নিচে এগুলি নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা হল। বিষয়-গুলি আগেই বলা হয়েছে অত্যন্ত সহজ ও সরল, ট্রেকিং-এর সময় এগুলি যথাযথ ভাবে মেনে চললে ট্রেকাররা হাতে হাতে ফল পাবে। এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই এগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

দলের লিডারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে দলের প্রতিটি সদস্য মাউণ্টেন ম্যানার্সগুলি কঠোরভাবে মেনে চলে। এবং কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি হলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

● অভিনন্দন জানানো (গ্রিটিংস)

পথ চলার সময় স্থানীয় লোকজন বা পথ চলতি অন্য ট্রেকারদের সঙ্গে দেখা হলে অভিনন্দন জানানো উচিত। স্থানীয় লোকজনদের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়।

অভিনন্দন জানাতে পয়সা খরচ হয় না, মৃদু হাসিমুখ নিয়ে নমস্তে, হ্যালো বা হাত তুলে নমস্কার জানালেই কাজ চলে যায়। দেখা যাবে শুধু এইটুকুতেই অযাচিত ভাবে অনেক মূল্যবান তথ্য বা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। চলার পথে যা একান্ত প্রয়োজনীয়।

● গ্রামের পথে চলার সময় ভব্যতার প্রকাশ (কান্ট্রি কার্টসী)

ক) গ্রামের পথে চলার সময় স্থানীয় গ্রাম প্রধান বা মুখিয়ার সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করে চলতে হবে।

খ) গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও আচার ব্যবহারের সময় যেন ভদ্রতা বিনয় ও নম্রতায় ছাপ ফুটে ওঠে। গ্রামের ভিতর দিয়ে চলার সময় স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত।

গ) চাষের জমির মধ্য দিয়ে চলার সময় কখনই ফসলের উপর দিয়ে বা নতুন রোপন করা চারা গাছগুলির উপর দিয়ে হাঁটা উচিত নয়।

ঘ) পথ চলার সময় বিনা অনুমতিতে কখনই স্থানীয় জনসাধারণের বাগানের ফুল বা ফল ছেঁড়া চলবে না। সামান্য একটি ফুল বা ফল ছেঁড়া মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

ঙ) চলার সময় দুটি খোলা চোখ আর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চললে অনেক অজানা তথ্য আপনিই জানা যাবে।

চ) অভব্য আচরণ থেকে সব সময় বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে একজন দরিদ্র পাহাড়ী মানুষ, পোর্টার বা সামান্য দোকানদারের এবং তাদের

পরিবারবর্গের যথেষ্ট আত্মসম্মান বোধ আছে।

ছ) পথে মহিলাদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিনা অনুমতিতে মহিলাদের ছবি তোলা এবং অভব্য আচরণ চরম বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে।

জ) স্থানীয় অধিবাসীদের বিরক্তি উৎপাদন করে তারস্বরে গান গাওয়া বা বাজনা বাজাতে বাজাতে পথ চলা উচিত নয়।

ঝ) মদ্যপান বা নেশাগ্রস্ত হয়ে পথ চলা উচিত নয়। ট্রেকিং-এর সময় মদ্যপান কঠোরভাবে বর্জনীয়।

ঞ) গ্রামের বাড়িঘর, বেড়া বা পাথরের দেওয়াল নষ্ট বা ক্ষতি করা উচিত নয়। এ ধরনের আচরণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

ট) স্থানীয় দেবস্থান, লৌকিক দেবদেবী এবং স্থানীয় সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি কখনই অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। এগুলির প্রতি এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা যায়।

● পদযাত্রায় আচরণ (ট্রেকিং ম্যানার্স)

ক) চলার পথে সামনে অপর কোনও ট্রেকার বা পর্বতারোহী দল থাকলে বিচক্ষণতার সঙ্গে একটি নিয়মিত দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলা উচিত। অগ্রগামী দলটিকে অতিক্রম করতে হলে, সেই দলের লিডারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, অনুমতি নিয়ে, তবেই তাদের অতিক্রম করা উচিত।

খ) স্বাভাবিক ছন্দে পথ হাঁটা উচিত। পাহাড়ী রাস্তায় কখনই তাড়া-হুড়ো করা উচিত নয়।

গ) সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে আস্তে হাঁটা বা ধীরগামী ব্যক্তিকে রাস্তার বিপজ্জনক অংশে সঙ্গ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ঘ) একা পথ হাঁটা কোন সময়েই উচিত নয়। সব সময় অন্তত একজন সঙ্গীকে নিয়ে পথ হাঁটা উচিত। দুর্ঘটনা অসুস্থতা, পথ হারানো, বিপজ্জনক ঢালে গড়িয়ে পড়ে যাওয়া, অথবা কোনও বন্য জন্তুর আক্রমণের সামনে পড়ে যাওয়া, পাহাড়ে কিছুই বিচিত্র নয়। তখন সাহায্যের জন্য কেউই থাকে না। এরকম ক্ষেত্রে পাহাড়ে বহু মৃত্যু ঘটে গেছে।

● দূরত্ব নির্ণয় (জাজিং ডিসটেন্স)

পাহাড়ে দূরত্ব নির্ণয় করা শক্ত। কারণ উঁচু পাহাড়ী পরিবেশ থেকে সোজাসুজি লক্ষ্য বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হাঁটা পথে সেই জায়গায় যেতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে। আসলে পাহাড়ী রাস্তায় দূরত্বকে মাইল

বা কিলোমিটারের হিসাবে না এনে সময় দিয়ে মাপাই শ্রেয়। স্থানীয় অধিবাসীদের এই বিষয়ে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কারণ তাদের হাঁটার অভ্যাস ও ধরণের সঙ্গে ট্রেকারদের হাঁটার অভ্যাস ও ধরণের আকাশ পাতাল পার্থক্য। এক্ষেত্রে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি এবং ম্যাপকে অনুসরণ করাই সঠিক উপায়।

● তথ্য প্রদান (পাসিং ইনফরমেশন)

পাহাড়ী রাস্তায় পথ চলার সময় সদ্য ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা যেমন, বন্যা, পুল ভেঙে পড়া, ধ্বস নেমে রাস্তা ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি অনেক সময়েই চোখে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রামের প্রধান বা মুখিয়াকে বিষয়টি অবশ্যই জানাতে হবে।

● পাথর স্থানচ্যুত করা (থ্রোয়িং স্টোন)

পাহাড়ে চলার পথে ভুল করেও কোন পাথর বা বোল্ডার স্থানচ্যুত করা উচিত নয়। উপর থেকে পাথর গড়িয়ে নামছে এমন দৃশ্য দেখা বেশ মজার হলেও এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। কারণ এই সামান্য গড়ানো পাথরটিই নিচে থেকে উপরে উঠে আসছে এমন কোনও ট্রেকার বা স্থানীয় জন সাধারণের মৃত্যুর কারণ হতে পারে অথবা কোনও বড় ধরণের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে।

● চিৎকার চেঁচামেচি বা উত্তেজনাপূর্ন ব্যবহার (নয়েজি বিহেভিয়ার)

পাহাড়ে চিৎকার চেঁচামেচি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নয়। সমস্ত রকমের অপ্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি, চিৎকার করা, বাঁশী বা হুইসেল বাজান, বা রাত্রে এখানে সেখানে অনাবশ্যক টর্চের আলো ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সমস্ত ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক। এই শব্দ বা আলো পাহাড়ের উচ্চ অংশে অবস্থানকারী কোনও ব্যক্তি বা অত্যন্ত বিপজ্জনক অংশে আরোহণকারীর কাছে বিপদ সংকেত হিসেবে গণ্য হয়ে মনঃসংযোগ বিঘ্নের কারণ হতে পারে। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অথবা শব্দের জন্য পাহাড়ের বরফের রাজ্যে এ্যাভেলান্স ঘটে যেতে পারে। এর ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা।

● থাকার জায়গায় পালনীয় কর্তব্য (হাট ম্যানার্স)

কোনও রেস্টহাউস, ডাক-বাংলো, ইয়ুথ হোস্টেল, ক্যাম্প, স্কুল ইত্যাদিতে

রাত কাটাতে হলে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধে নেবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কোনও আশ্রম বা দেবস্থানে উঠলে সেই আশ্রমকে দেবস্থান ভাবতে হবে এবং দেয় সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করতে হবে।

অন্য কোনও দলেরও সঙ্গে রাত কাটাতে হলে জিনিসপত্র আলাদা ভাবে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলে চলবে না। অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করে চিৎকার চেঁচামেচি বা গান গাওয়া, বাজনা বাজানো অনুচিত।

● বিপদে উদ্ধারকার্য বা সাহায্য (রেসকিউ ওয়ার্ক)

মাউণ্টেন লাভার্স বা পাহাড়প্রেমীদের ঐতিহ্য এই যে, বিপদ বা দুর্ঘটনার সময় অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এই ঐতিহ্যের কথা প্রতিটি ট্রেকারকে মনে রাখতে হবে। অন্যের বিপদে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে যাওয়া ট্রেকারদের অবশ্য কর্তব্য।

যখন কোন ট্রেকারের ক্যাম্প থেকে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে, তখন অবশ্যই দলনেতার কাছে কখন, কোথায়, কোন পথে যাওয়া হচ্ছে, কোন পথে ফেরা হবে এবং কখন ফেরা হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ তথ্য দুর্ঘটনার এবং বিপদ এড়ানোর জন্য জানিয়ে যেতে হবে।

● নিদর্শন পেশ (প্রুফ অব অ্যাসেণ্ট)

ট্রেকার বা মাউণ্টেনিয়ারদের মনে রাখা উচিত প্রতিটি পর্বতপ্রেমীই অভিযানগুলির সঠিক সংবাদ পেতে আগ্রহী। এই সংবাদ ও প্রতিবেদন যথার্থ ভাবে পেশের জন্য ফটোগ্রাফ বা অনুরূপ প্রত্যয় সৃষ্টিকারী নিদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত। আবেগ বা উচ্ছ্বাসময় শুধুমাত্র লিখিত প্রতিবেদন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় সৃষ্টি করে। কাজেই ফটোগ্রাফ বা অনুরূপ প্রত্যয় সৃষ্টিকারী নিদর্শন পেশ করাই কর্তব্য।

● প্রতিবেদন পেশ (মেকিং স্টেটমেণ্ট)

পার্বতাভিযান বা ট্রেকিং-এর ক্ষেত্রে কেবল মাত্র দলনেতা বা লিডার আই. এম. এফ্. বা সংবাদপত্র অথবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে।

পাহাড়ের নীতি
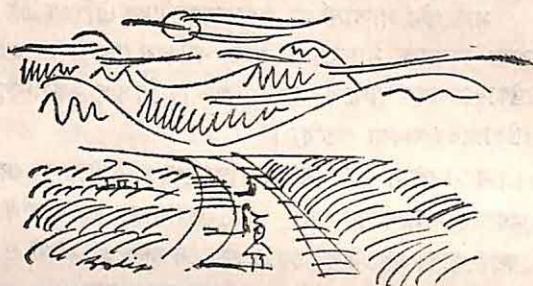
দুর্ঘটনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ান পাহাড় ও পর্বতপ্রেমীদের মহান ঐতিহ্য।

দলের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা এবং সৌহার্দের বন্ধন একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই তা ছিন্ন করতে পারে না।

অপরিকল্পিত উদ্যোগ এবং অযৌক্তিক ঝুঁকি গ্রহণ কখনই সাহস অথবা তেজস্বীতা হিসেবে গণ্য করা হবে না।

কোন অভিযানের সাফল্য কখনও কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বিশেষের সম্মান ও শৌর্য হিসেবে গণ্য করা হবে না।

পাহাড়ে নিরাপত্তা

প্রাকৃতিক কারণজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ে নগণ্য। এ ছাড়া পাহাড়ে যত দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে তার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু পর্বতারোহী বা ট্রেকাররা নিজেরাই দায়ী। নিজের শক্তিসামর্থ বা দক্ষতার উপর মাত্রাতিরক্ত গুরুত্বদান, খুব নিম্নমানের পর্যবেক্ষণ শক্তি, অপ্রতুল জ্ঞান, অনভিজ্ঞতা, সদস্যদের মধ্যে "একটি দল" এই মনোভাব নিয়ে চলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং কখনও ভ্রান্ত-চিকিৎসা পাহাড়ে দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির অন্যতম কারণ।

"ঝুঁকি" কথাটি যখন পর্বতারোহণের অঙ্গ, তখন সকলকেই নিরাপত্তার নিয়ম কানুনগুলি জেনে রাখতে হবে।

"নিরাপত্তা সর্বপ্রথম কথা" এই বোধ এবং মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য "নিরাপত্তা বিষয়ে" বেশি বেশি প্রশিক্ষণ পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্য মূল্যবান কথা। এবং এই কারণেই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী বা ট্রেকাররা পাহাড়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকে।

নিরাপত্তার জন্য কিছু মুল্যবান কথা ঃ

ক) মাউন্টেন ম্যানার্স সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে।

খ) পাহাড়ের বিপদ-আপদকে যথাযথভাবে জানা এবং সেগুলিকে মনে রেখে চলতে হবে।

গ) অভিযান পরিকল্পনাকে সূক্ষ্মভাবে কনটু্যর মাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

ঘ) যে কোনও ধরণের খারাপ অবস্থার জন্য ব্যবস্থা নিতে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঙ) সব সময় পর্যাপ্ত খাবার ও গরম জামা কাপড় সঙ্গে রাখতে হবে।

চ) সব সময় একটি ফাস্ট-এইড বাক্স সঙ্গে রাখতে হবে। যার মধ্যে বমি, মাথা ধরা, ঠাণ্ডালাগা, জ্বর, গা গুলান, পেটের অসুখ, গলা ব্যথা, এবং কাটা ছেঁড়ার ওষুধ ও তুলো, ব্যাণ্ডেজ, লিউকো-প্লাস্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থাকবে।

ছ) গন্তব্যস্থলের পথের ভূ-প্রকৃতি, রাস্তার বিবরণ এবং দলের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

জ) সময়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাকে অসীম গুরুত্ব দেওয়া পাহাড়ে একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকতে হবে যেন প্রতি দিনের পদযাত্রা বা আরোহণ (বিশেষ করে শীতকালীন) যেন দিনের আলো থাকতে থাকতেই নিষ্পন্ন হয়। দুপুরের পর যে কোনও ধরণের যাত্রার উদ্যোগ খারাপ বলে ধরে নিতে হবে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে "সকাল সকাল শুরু এবং সকাল সকাল শেষ" এই কথা পাহাড়ের পক্ষে আদর্শ।

ঝ) পাহাড়ী নদী, নালা, ঝর্ণা এবং গ্লেসিয়ার অতিক্রম করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সকালের দিকে রোদ উঠলে উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলা শুরু হয়। তাই যত সকাল সকাল পাহাড়ী নদীগুলি অতিক্রম করা যায় ততই ভাল।

ঞ) পাহাড়ে ও জঙ্গলে পথ হারানো বিচিত্র কিছুই নয়। এ সময় কোন কারণেই আতঙ্কগ্রস্ত হলে চলবে না। নিজেকে ধীর ও শান্ত রাখতে হবে। খুব যত্নের সঙ্গে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে সবচেয়ে সহজ, সরল ও ভাল উপায়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। মনে রাখতে হবে বিপদে ধৈর্য্যই সম্বল।

ট) পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে শীর্ষ আরোহণের পর বা হাই-অলটিচিউট ট্রেকিং-এর অনুরূপ ক্ষেত্রে অবতরণের সময় সবচেয়ে সতর্কতা দরকার। পর্বতারোহী বা ট্রেকাররা এই সময় স্বাভাবিক কারণে বিশ্রামের জন্য উন্মুখ থাকে। বিশেষ করে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে শীর্ষ আরোহণের পর একটা গা-ছাড়া ভাব দেখা দেয়, যার ফলে অবরোহণকারীরা অসতর্ক বা অসাবধান হয়ে পড়ে। আর এই কারণেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। দেখা গেছে পর্বতশীর্ষ,

খাড়াই ঢাল, ক্লিফ ইত্যাদিতে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে সবই ওই নামার পথে, শীর্ষারোহণের পর। ট্রেকারদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। কোন অবস্থাতেই অসতর্ক বা অসাবধান হলে চলবে না।

ঠ) পাহাড়ে যদি এমন কোনও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেখানে আকাশ পথে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে তবে অবিলম্বে I.M.F-কে টেলিগ্রাম বা বেতারে সংবাদ পাঠাতে হবে নিম্ন ঠিকানায়ঃ

Indian Monutaineering Foundation
Ananda Niketan
near—Rao Tularam College
Benito Jaurez Road, New Delhi-110021.

ড) সমস্ত কিছুর পরেও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারাই একজন পর্বতারোহী বা ট্রেকারের সবচেয়ে বড় গুণ।

পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটার নিয়ম
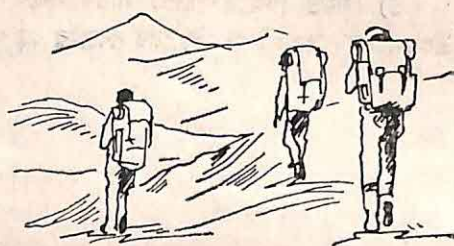
পরিচিত ও অভ্যস্ত ভৌগোলিক পরিবেশের বাইরে পাহাড়ী পথে হাঁটার সময় একজন নতুন ট্রেকারের সামনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে সে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। চড়াই-উৎরাই, বিপজ্জনক পাহাড়ী ঢাল, নদী বা নালাগুলির প্রবল জলস্রোত, ঘন অরণ্য, বিস্তীর্ণ তুষার ক্ষেত্র, ভোর রাতে পাথুরে পথ বা বোল্ডারের ওপর জমে থাকা পাত্‌লা সরের মতো বরফের আস্তরণ (Verglas) এগুলির প্রতিটিই বিপদ বা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে এই সব ঝামেলার মোকাবিলা করতে হয় একজন ট্রেকারকে। এগুলি সমস্যা ঠিকই, কিন্তু এমন নয় যে চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে পথ চলতে হবে। এ সব সমস্যার সমাধানের উপায় আছে। এবং তা জানা থাকলে খুব সহজেই এইসব প্রতি-বন্ধকতাগুলি অতিক্রম করা যায়। পথ চলায় তখন শুধুই আনন্দ। পথ চলায় তখন আপনা থেকেই একটা ছন্দ জন্ম নেয়। আর এমনি ভাবেই একজন ট্রেকার ধীরে ধীরে একজন উন্নত মানের পর্বতারোহী বা মাউণ্টেনিয়ারে পরিণত হয়।

কেমন করে পাহাড়ে হাঁটতে হবে তার জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম কানুন আছে, সেগুলি মনে রাখলেই আর চিন্তা নেই।

১। পাহাড়ী পথে চলার সময় ট্রেকারদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে, জলের বোতল, খাবার, ম্যাপ, কম্পাস, ফার্স্ট-এইড বক্স, গরম জামা কাপড়, বর্ষাতি এই

সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যেন সব সময় নিজের কাছে থাকে। পিঠের বোঝা কমানোর প্রচেষ্টায় কখনই এগুলি পোর্টার বা সতীর্থ কারুর কাছে পাচার করা চলবে না। বাধ্যতামূলক ভাবে এগুলি নিজের কাছে রাখা উচিত।

পথ চলার সময় কখনই তাড়াহুড়ো করতে নেই। তাড়াহুড়ো করার অর্থ ট্রেকিং-এর আসল আনন্দ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং বিপদ ডেকে আনা।

পাহাড়ী পথে তাড়াহুড়ো করে পথ চলায় পেশীতে চাপ লাগার ফলে ক্লান্তি আসে। হৃদপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ায় বুক ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। এর ফলে প্রথমত দেহ অবশ হয় বা আরও বড় ধরণের বিপদ ঘটে যেতে পারে।

তাড়াহুড়ো সব সময় বর্জন করতে হবে। একজন ট্রেকার যদি এক ঘণ্টায় এক মাইল পথ বা এক হাজার ফুট চড়াই উঠতে পারে, তবে তা খুবই ভাল হাঁটা বলা যায়। বাহাদুরি দেখানোর জন্য এর বেশি কিছু করা অনুচিত। পাহাড়ে যে যত ধীরে, সময় নিয়ে উঠবে, পাহাড় তার কাছে ততই নিরাপদ। দ্রুত, সময় না নিয়ে পাহাড়ে ওঠার অর্থ বিপদ ডেকে আনা।

২। পাহাড়ী পথে ট্রেকিং সকাল সকাল শুরু করা এবং সকাল সকাল শেষ করা সবচেয়ে ভাল। ইংরাজী ভাষায় যাকে "গোল্ডেন রুল" বলে এটা তাই। অর্থাৎ ট্রেকিং-এর সময় যত ভোর বেলায় উঠে যাত্রা শুরু করা যাবে আর যত তাড়াতাড়ি যাত্রা শেষ করা যাবে ততই ভাল। অভিজ্ঞ আর বিচক্ষণ ট্রেকাররা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলে।

দুপুরের পর থেকেই পাহাড়ের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানে আবহাওয়ার প্রকৃতি বদলে যায়। সাধারণত দুপুর দুটোর পর থেকে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। এর কারণ ভূগোলবিদ্‌দের ভাষায় অ্যানাবেটিক আর ক্যাটাবেটিক উইন্ড। ভোর বেলায় ঠাণ্ডা বাতাস উপর থেকে নিচু পাহাড়ী অঞ্চলে বয়ে যায়। আর দুপুরের পর থেকেই (katabetic wind) নিচের গরম বাতাস উপরে উঠে আসে। এর ফলেই আবহাওয়ার ধরণ ধারণ বদলে যায়। বৃষ্টি, তুষার পাত, ঝোড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এর যে কোনও একটা বা একযোগে অনেকগুলি ট্রেকারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সাবধানের মার নেই। বেলাবেলি ট্রেকিং শেষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সকালের দিকে যাত্রায় অন্য দিক দিয়েও ট্রেকাররা সুবিধে ভোগ করে থাকে। এ সময় সুন্দর শান্ত আবহাওয়ায় সমস্ত কিছুই সুন্দর দেখায়। বাতাস পরিষ্কার ও শক্তিদায়ক থাকে। আকাশে সূর্যের বিশেষ অবস্থানের ও পর্যাপ্ত আলো থাকার জন্য ক্যামেরায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঠিক মতো তোলা সম্ভব হয়।

রাত্রে তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার ফলে খুব উঁচু অঞ্চলের বরফ তখনও গলে না। এ কারণে নদী ও নালাগুলিতে জলের গভীরতা ও স্রোত কম থাকে।

ফলে সেগুলি সহজেই অতিক্রম করা যায়। তাড়াতাড়ি যাত্রা শেষ করার সময় পাওয়ার জন্য পছন্দ মতো জায়গায় তাঁবু খাটান যায়। এবং খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ করে রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগেই বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়া যায়।

৩। খালিপেটে পাহাড়ে হাঁটা উচিত নয়। আবার খুব ভর পেটেও হাঁটা যায় না। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার যেমন, কিসমিস, বাদাম, চিঁড়ে ভাজা, ছাতু, মুড়ি, বাতাসা এসব চলতে চলতে খাওয়া যায়। বাঙালী ট্রেকাররা অনেকেই মুড়ি বাতাসা পছন্দ করে থাকে। এটি আদর্শ খাবার। মুড়ি হালকা, সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং শক্তিদায়ক তো বটেই। পলিথিনের প্যাকেটে ভরে রাখলে সহজে মিইয়ে যায় না, তাজা থাকে।

৪। জরুরী অবস্থার কথা বিবেচনা করে সব সময়েই কিছু খাবার আর পানীয় জল সঙ্গে রাখা উচিত। প্রয়োজন ছাড়া সেগুলি খেয়ে শেষ করে ফেলা উচিত নয়।

৫। প্রতিদিন সকালে চা ছাড়াও কয়েক গ্লাস গরম জল পান করা উচিত। পরিশুদ্ধ গরমজল ওয়াটার বটলে ভরে রেখে চলতি পথে পান করলে উপকার পাওয়া যায়। এ ছাড়াও চলার পথে মিষ্টি ফলের রস, গরমপানীয়, গ্লুকোজ এসব খাওয়া উচিত।

৬। পাহাড়ী নদী বা ঝর্ণার জল পরিশুদ্ধ না করে, এবং হ্যালোজেন জাতীয় ওষুধ না মিশিয়ে কখনই পান করা উচিত নয়।

৭। প্রতিদিন নিয়ম করে একটি ভিটামিন সি ও বি-কমপ্লেক্স ট্যাবলেট খেলে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা কমে এবং শক্তির জোগান পাওয়া যায়।

৮। রোদের জন্য টুপি, ছাতা, লাঠি, সানগ্লাস, ক্যামেরা এগুলি হাতছাড়া করা উচিত নয়। ছাতা বা লাঠি পাহাড়ী রাস্তায় বন্ধু। ছাতা কাঠ বা বেতের লম্বা হাতল যুক্ত হওয়া উচিত। রোদ বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা ছাড়াও ছাতা লাঠির কাজ করে। এটিকে কখনই বোঝা মনে করা উচিত নয়।

লাঠি পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটার জন্য খুবই কাজে লাগে। পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটার জন্য লোহার ফলা লাগান বিশেষ ধরণের লাঠি পাওয়া যায়। স্কাউটরা তাদের বিবিধ কাজে লাঠিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত স্কাউট-লাঠি এমন হয় যে সোজা অবস্থায় দাঁড়ালে তা কাঁধ ছাড়িয়ে অন্তত কানের নিচের অংশ পর্যন্ত পেঁছবে। চোখের সমতলের উচ্চতায় লাঠিতে একটা ফুটো করা থাকলে নানা রকম এস্টিমেশনে (Estimation) খুব সুবিধে হয়। লাঠিতে যদি মি.মি, সে. মি, ইত্যাদি দাগ কাটা থাকে তবে নানা মাপ-জোকের হিসাব সহজে করা যায়। এ ছাড়া পাহাড়ে সাধারণ ভাবে লাঠি যে যে কাজে লাগতে পারে তা হল ঃ—

ক) যে কোন রাস্তায়, পাহাড়ী পথে বা কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় লাঠি ব্যবহার করে সহজে পথ চলা যায়।

খ) হঠাৎ প্রয়োজনে লাঠির সাহায্যে সাময়িক স্ট্রেচার বানিয়ে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে বহন করা সম্ভব।

গ) দুর্ঘটনায় হাত-পা ভাঙলে সাময়িক ভাবে স্প্লিণ্টের ন্যায় ব্যবহার করা যায়।

ঘ) কোন জন্তু কামড়াতে এলে লাঠির সাহায্যে প্রতিহত করা যায়।

ঙ) অনেক ক্ষেত্রে গভীরতা বা উচ্চতা লাঠির সাহায্যে মাপা যায়। ফাটল, গর্ত ইত্যাদি নির্ণয় করা চলে।

চ) ছোটখাট উচ্চতার বোল্ডার, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি লাঠির সাহায্যে অতিক্রম করা যায়।

ছ) ট্রেসল, ট্রাইপড্ বা তাঁবুর পোল হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৯। ট্রেকিং চলা কালীন অধিক উচ্চতায় ওঠার আগে অ্যাক্লেম্যাটাইজেশন-এর বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কোন অবস্থাতেই এই বিষয়টির অবহেলা করা চলবেনা। ২৩০০—২৫০০ মিটার উচ্চতায় ওঠার পর অবশ্যই এবং আরও অধিক উচ্চতায় ওঠার আগে সেই জায়গায় অন্তত দু-দিন অপেক্ষা করতে হবে।

১০। কখনই অধিক ভার বহন করা উচিত নয়। বেশি পরিশ্রম বিপদ ডেকে আনে।

১১। হালকা ঢিলেঢালা পোষাক পরা ভাল। তাই বলে চারিদিকে ঝুলছে এই রকম ঢলঢলে জামাপ্যাণ্ট পরা চলবেনা। জামা ও প্যাণ্ট ঘন মোটা কাপড়ের হলেই ভাল। এতে দড়ি ধরে র‍্যাপলিং করে পাহাড়ের গায়ে নামবার সময় সুবিধা হয়। তখন দড়ির ঘষায় জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ে যাবার বা গায়ের ছাল চামড়া উঠে যাবার ভয় থাকে না।

১২। হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং এর সময় পোষাক কয়েকটি স্তরে সংযুক্ত হলে ভাল হয়। সঙ্গে বায়ু নিরোধক বা উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট থাকা উচিত। পর্যাপ্ত গরম জামা কাপড় সব সময়েই সঙ্গে রাখা উচিত।

১৩। পাহাড়ে পথ চলার সময় গতি সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। খুব দ্রুত চলা বা অত্যন্ত আস্তে চলা উভয়েই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। মাঝামাঝি গতিতে কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে ধীর ছন্দে পথ চলা উচিত।

১৪। কখনও দ্রুত চলতে হলে দৌড় বা তাড়াতাড়ি পা না ফেলে পদক্ষেপ বড় অর্থাৎ লম্বা করলেই যাত্রা পথ দ্রুত অতিক্রম করা যাবে।

১০। হাঁটার যে সাধারণ নিয়ম সে ভাবেই পাহাড়ে পথ চলা উচিত। অর্থাৎ শুধুমাত্র পায়ের আঙুলের ওপর ভর না দিয়ে পায়ের পুরো পাতাকে ভূমির সংস্পর্শে রেখে পথ চলতে হবে। হাতের আন্দোলন কম করলে

শক্তিক্ষয় কমবে।

১৬। চড়াই রাস্তায় চলার সময় একটু সামনে ঝুঁকে পথ চলা নিয়ম। এতে পিঠের ওপর বোঝার ভার উপর দিকে উঠে যাবে। ফলে ফুস-ফুস বিশ্রাম পাবে। খুব চড়াই রাস্তায় হাঁটার সময় আড়া-আড়ি ভাবে এঁকে বেঁকে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে জিগ্-জ্যাগ্ বলে সেই ভাবে উপরে উঠতে হয়।

১৭। ভিজে ঘাস, ভিজে গাছের শিকড়, ভিজে মাটি এবং পাইন গাছের ঝরা পাতা বা অন্য কোনও গাছের ভিজে পাতার ওপর দিয়ে পথ চলার সময় অত্যন্ত সাবধান হয়ে পথ চলতে হয়। এগুলি সাধারণত খুব পিচ্ছিল হয় এবং অসাবধানে দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

উঁচু পাহাড়ী জায়গায় রাত্রে তাপমাত্রা নেমে যায়। ফলে পাথুরে রাস্তা, বড় পাথরের স্লাব, বোল্ডার, নদী বা ঝর্ণার ধারের পাথরের উপর জমে থাকা জল পাতলা বরফের স্তরে (verglas) পরিণত হয়। এগুলির উপর অসাবধানে পা ফেললেই পা পিছলে যাবে। কাজেই সকালের দিকে এ সব অঞ্চলে পথ চলার সময় অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

স্ক্রী-জোন, বা হিমবাহের বয়ে আনা পাথর ছড়ান জায়গা গুলি দিয়ে ওঠা বা নামার সময় অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। এই পাথর গুলি সাধারণত খুব আলগা হয়। সামান্য ধাক্কাতেই এগুলি বিপজ্জনক ভাবে গড়িয়ে নেমে আসে। এই জায়গাগুলি পথ হিসেবে ব্যবহার যতদূর সম্ভব না করাই ভাল। একান্তই যদি এড়ানো সম্ভব না হয় তবে এ্যারো হেড (∧) ফর্মেশনে পথ চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই এই সব জায়গায় নামার সময় পিছলে নামা উচিত নয়। কারণ এই জায়গাগুলি নামতে নামতে হঠাৎ-ই বিপজ্জনক ভাবে অত্যন্ত গভীর কোনও খাদের সীমায় শেষ হয়।

১৮। পাহাড়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে চলতে চলতে কখনই দলছেড়ে হঠাৎ কোথাও একা যাওয়া উচিত নয়।

১৯। পথের ধারের বা উপরের কোনও পাথর স্থানচ্যুত করা উচিত নয়।

২০। পথ চলতে চলতে অজানা, অপরিচিত, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনও বস্তুকে স্পর্শ করা, নাড়াচাড়া করা বা তা নিয়ে গোঁয়ার্তুমি করা উচিত নয়।

২১। অজানা কোন কীট পতঙ্গ বা প্রাণীকে স্পর্শ করা বা নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

২২। অজানা কোনও ফুল বা লতাপাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করা, স্পর্শ করা বা গন্ধ শোঁকা উচিত নয়। বিশেষ করে সেগুলি রঙিন হলে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

২৩। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। বিশ্রামের

সময় কোনও গাছ বা পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকার সময় পা-দুটি একটু উঁচু করে রাখলে আরাম পাওয়া যায়। পাহাড়ী পথে হাটার সময় এবং ভার বহনের জন্য পায়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এই অবস্থা পা-কে ক্লান্তি-কর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়।

২৪। বিশ্রামের সময় গরম জামা কাপড় পরে নিতে হবে। তবে জামার বোতাম, বা চেন খুলে রাখা উচিত। বিশ্রামের পরই দ্রুত পথ চলা শুরু না করে ধীরে ধীরে চলার গতি বাড়ানো উচিত।

২৫। মাথাঘোরা, গা-গুলানো, ঝিমুনি এগুলি সবই অধিক উচ্চতা-জনিত অসুস্থতার লক্ষণ। যত ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা যাবে এগুলির প্রকোপ ততই কমবে। এবং নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়, নিরাপদে পাহাড়ে পথ চলার আনন্দ উপভোগ করা যাবে। উপরোক্ত অসুস্থতা গুলি যদি সাধারণ ওষুধে না কমে তবে ট্রেকারকে অবশ্যই কম উচ্চতায় নেমে যেতে হবে।

২৬। জুতোর ফোস্কা পড়া বন্ধ করার জন্য যেখানে পায়ের চামড়া জুতোর সঙ্গে ঘসছে সেখানে ফোস্কা পড়ার আগেই একটু এডহিসিভ টেপ বা ব্যাণ্ডেড লাগিয়ে দিলে ফোস্কা পড়বে না।

২৭। সাধারণ কাটা, ছেঁড়া, পায়ের ফোস্কা ইত্যাদি ছোটখাট ব্যাপারকে কখনই অবহেলা করা ঠিক নয়। ওগুলি যথাযথ ভাবে চিকিৎসা করে আগেই সারিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ঠাণ্ডা ও তুষারাবৃত অঞ্চলে এগুলি সহজেই তুষার ক্ষত বা ফ্রস্ট-বাইটে পরিণত হয়ে যায়।

কম্পাস, ম্যাপ ও দিক নির্ণয়
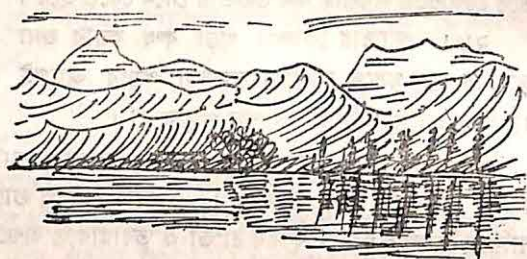
পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে ট্রেকার পথ হারিয়ে ফেলেছে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে কেবল গাছ। রাস্তার চিহ্ন মাত্র নেই। নির্জন পরিবেশ। এসময়ে তার একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু ম্যাপ আর কম্পাস। দেবদূত বললেও ভুল হয় না।

ট্রেকিং চলাকালীন প্রথম দরকার গন্তব্যস্থলের পথ ঠিক করে চেনা। পরিচিত বা সেট প্যাটার্ন রুটে পথ চেনা খুব একটা সমস্যা নয়। সাধারণতঃ সেখানে পথের মাঝে পথ চলতি অন্য ট্রেকার, গাইড, পোর্টার এদের কাছ থেকেই সাহায্য পাওয়া যায়। তাছাড়া সুস্পষ্ট পথ রেখা, বহু প্রচলিত ট্রেকার্স ম্যাপ এসব সহজ লভ্য। কিন্তু সবক্ষেত্রে এমন সুবিধে পাওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে ট্রেকিং রুট যদি সেট-প্যাটার্নের বাইরে হয় সেখানে সমস্যা আসে। এক্ষেত্রে পথ অভিযাত্রীদের নিজেদেরই চিনতে হবে। অচেনা পথে ম্যাপ আর কম্পাস ব্যবহার করে ঠিকমত পথ চলা নিয়ম। অজানা অচেনা পথে ম্যাপ এবং কম্পাস সঙ্গে নেওয়া এবং তার ব্যবহার জানা অবশ্য প্রয়োজন।

ম্যাপ থেকে রাস্তা ঠিক করতে হলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

ক) যাত্রাপথ কোন জায়গা থেকে শুরু এবং কোথায় শেষ।

খ) যাত্রাপথ কোন পথে হলে সুবিধে হয়।

গ) বিপদ সঙ্কুল পথ এড়ান সম্ভব কিনা।

ঘ) সবচেয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে কোন পথ সাহায্য করবে।

ঙ) নদী, খাবার জল ইত্যাদি পথে পাওয়া যাবে কিনা।

চ) পথে কোথায় বিশ্রাম করা যাবে তার মোটামুটি ধারণা।

ছ) আনুমানিক কতটা পথ চলতে হবে।

কম্পাস ঃ

এখন কম্পাস সম্পর্কে ধারণা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কম্পাসের মধ্যে বিখ্যাত কম্পাস, মেরিনার্স কম্পাস। এর কথা সকলেই ছোটবেলা থেকে আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। এছাড়া আরও দু-ধরনের কম্পাস আছে নিড্‌ল কম্পাস আর ডায়াল কম্পাস। সবচেয়ে ভাল কম্পাসগুলি বিদেশী। সিল্ভা কোম্পানীর কম্পাস পাওয়া গেলে ভাল হয়।

নিড্‌ল কম্পাসে যন্ত্রের চুম্বক কাঁটাটি একটি বৃত্তের ওপরে থাকে। এই বৃত্ত ৩৬০ ভাগে ভাগ করে আঁকা। সেখানে একটি বৃত্তে উত্তর-N, দক্ষিণ-S, পূর্ব-E, পশ্চিম-W এই ভাবে নির্দেশ করা থাকে। কম্পাস ব্যবহারের সময় সেটি এমন ভাবে ঘুরিয়ে রাখতে হবে যাতে কাঁটার উত্তর দিক কম্পাসে নির্দেশ করা উত্তর দিকের ওপর থাকে।

ডায়াল কম্পাসে যথাযথ ভাবে বৃত্তটি একটি গোল চাকতির ওপর আঁকা থাকে। আর চুম্বক কাঁটাটি তার উপর দক্ষিণ অক্ষ বরাবর আঁটা থাকে। ঐ চাকতির কেন্দ্র একটি সূচী মুখের ওপর এমন ভাবে ভর করে থাকে যেন তা বিনা বাধায় ঘুরতে পারে। এই কম্পাসের বিশেষ সুবিধা এই যে তা সেট করতে হয় না।

কম্পাস ব্যবহারের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন, কাছাকাছি কোনও লোহার জিনিস না থাকে।

কম্পাসের প্রধান চারদিক হল পূর্ব(E), পশ্চিম(W), উত্তর(N), দক্ষিণ(S)। প্রতিটি ৯০°-র তফাৎ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দিক হল চারটি—উত্তর আর পূর্বের মাঝে, উত্তর-পূর্ব (NW) বা ঈশান কোণ। উত্তর আর পশ্চিমের মাঝে, উত্তর—পশ্চিম (NW) বা বায়ু কোণ। দক্ষিণ আর পশ্চিমের মাঝে, দক্ষিণ-পশ্চিম (SW) বা নৈঋত কোণ। দক্ষিণ আর পূর্বের, মাঝে দক্ষিণ-পূর্ব (SE) বা অগ্নিকোণ এগুলির প্রতিটি ৪৫°-র তফাৎ।

তৃতীয় শ্রেণীর দিক হল এই আট দিকের প্রতিটির মাঝখানে একটি ভাগ। উত্তর—উত্তর-পূর্ব (NNE), পূর্ব—উত্তর-পূর্ব (ENE), পূর্ব—দক্ষিণ-পূর্ব

(ESE), দক্ষিণ—দক্ষিণ-পূর্ব (ESE), দক্ষিণ—দক্ষিণ-পশ্চিম (SSW), পশ্চিম—দক্ষিণ-পশ্চিম (WSW), পশ্চিম—উত্তর-পশ্চিম (WNW), উত্তর—উত্তর-পশ্চিম (NNW)।
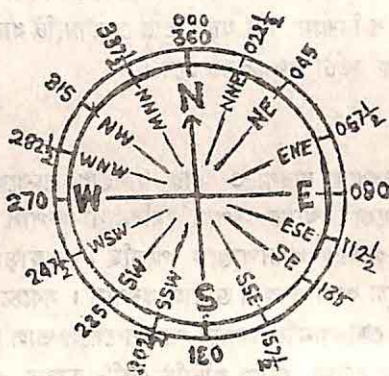
একটি বিন্দুর চারদিকে কোণের সমষ্টি ৩৬০-র সমান। উত্তর দিককে ০° বা ৩৬০° বলা হয়। ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে সেই দিকে কম্পাসের কোণকে ঘোরাতে হয়।

উত্তর—উত্তরপূর্ব (NNE) ২২½°, উত্তরপূর্ব (NE) ৪৫°, পূর্ব (E) ০৯০°, দক্ষিণ (S) ১৮০°, পশ্চিম (W) ২৭০°, উত্তর-উত্তর পশ্চিম (NNW) ৩৩৭½°। এই ডিগ্রী ভাগকে কম্পাস বিয়ারিং বলা হয়।

পৃথিবীর উত্তরদিকে উত্তর মেরুবিন্দু আর দক্ষিণে দক্ষিণ মেরুবিন্দু। উত্তর আর দক্ষিণ—মেরুবিন্দু বরাবর একটা অক্ষ রেখায় পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। আর এই ঘুরপাক খাওয়ার ফলে দুই মেরুর কাছে দুটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্র কম্পাসের কাঁটাকে সবসময় উত্তর আর দক্ষিণে টানে। ফলে আমরা সবসময় কম্পাসের কাঁটাকে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর থাকতে দেখি। যেন মনে হয় মেরুগুলির কাছে মাটির নিচে দুটি বিশাল চুম্বকের পাহাড় আছে। এই কাল্পনিক দুটি পাহাড়কে Magnetic North Pole ও Magnetic South Pole চৌম্বক উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরু বলি। একটা মজার কথা এই যে চৌম্বিক মেরুগুলি আর পৃথিবীর মেরুগুলি কিন্তু এক জায়গায় অবস্থিত নয়। দুই বিন্দুতে প্রায় ১৪০০ মাইলের তফাৎ। তাই কম্পাস দিয়ে আমরা যে দিক নির্ণয় করি তা ঠিক আসল উত্তর বা দক্ষিণ দিক নয়। এগুলি হল চৌম্বক উত্তর বা দক্ষিণ দিক। সঠিক দিক জানতে হলে বিচ্যুতি তালিকা (Delination chart) সংগ্রহ করে কম্পাস পাঠের সঙ্গে তত ডিগ্রী যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। কলকাতার বিচ্যুতি ১.১০´ পশ্চিম (১৯৬২)।

এখানে এই যে ১৯৬২ সাল কথাটি দেওয়া আছে তার কারণ আছে। কারণ বাড়া কমার প্রশ্ন, কলকাতার ক্ষেত্রে প্রতিবছর এই বিচ্যুতি পশ্চিমে ২' বাড়ে।

ম্যাপ ও কম্পাসের ব্যবহার ঃ

ম্যাপে সাধারণত ভৌগলিক উত্তর মেরুর দিক (true north) বোঝাতে একটি লাইনের মাথায় * চিহ্ন দেওয়া হয়। এবং চৌম্বক উত্তর বা Magnetic North দেখাতে একটি তীর চিহ্ন আঁকা (→) হয়।

ট্রেকিং এর সময় পথ চলাকালীন সবসময় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ স্থান চিহ্ন যেমন— বড় গাছ, বিশেষ ধরনের গাছ, পাহাড়, টিলা এসব (Landmark) লক্ষ্যরাখা দরকার। এগুলি দিক নির্ণয়ে এবং সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

ম্যাপ সেটিং (Map Seting) ঃ

সঙ্গে ম্যাপ থাকলে ট্রেকার তার অবস্থান ঠিক করে নিয়ে এবং বিশেষ স্থান চিহ্ন (landmark) স্থির করে ম্যাপকে সেই স্থান চিহ্ন বরাবর ঠিক ভাবে সেট (set) করে সহজেই দিক নির্ণয় করতে পারে।

এখন এই ম্যাপ কীভাবে সেট (set) করতে হবে তা জানতে হবে। এ সম্পর্কে নিয়ম এই যে ঃ—

ক) প্রথমে ম্যাপটিকে একটি সমতল জায়গায় বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর একটি কম্পাস রেখে ম্যাপটিকে ঘুরিয়ে কম্পাসের উত্তর দিকের সঙ্গে ম্যাপের চৌম্বক উত্তর দিকের এক লাইন বরাবর করলে ম্যাপটি সেট (set) হয়েছে বলা যায়।

খ) ট্রেকার যে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ম্যাপটি ঘুরিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ম্যাপের চলার রাস্তা ও ট্রেকারের চলার রাস্তা একই সমান্তরালে থাকে।

এবার লক্ষ্য রাখতে হবে ম্যাপের রাস্তার বাঁদিকের চিহ্নিতবস্তু ট্রেকারের চলার রাস্তার বাঁদিকে আছে কিনা। এভাবে মিলে গেলে ম্যাপ সেট হয়েছে বোঝা যাবে। উল্টো হলে ম্যাপ ১৮০° ঘুরিয়ে নিতে হবে।

(গ) ম্যাপে দেখান দুটি বিশেষ চিহ্নিত বস্তু দেখতে হবে। যে দুটি ট্রেকারের অবস্থান স্থান থেকে দুধারে দেখা যায়। ম্যাপের ওপর একটি পেনসিল রাখে ম্যাপটি ঘোরাতে শুরু করতে হবে। পেনসিলের দুই দিক যখন ম্যাপের চিহ্নিত বস্তুর দুটি দিক দেখাবে তখন জানা যাবে ম্যাপ সম্পূর্ণ সেট হয়েছে।

স্কেল ও ব্যবহারসিদ্ধ চিহ্ন ঃ

কোনও বিশেষ স্থানের নক্সা যাতে মাপন চিহ্ন (Scale) দিক চিহ্ন

(Compass), ব্যবহার সিদ্ধ চিহ্ন (Conventional Sign) আর সীমারেখা (Boundary) দেওয়া আছে তাকে সেই জায়গার ম্যাপ বলে।

স্কেল (Scale) **:**

প্রত্যেক ম্যাপে তার মাপন চিহ্ন বা স্কেল, ম্যাপের কোনও একটি জায়গায় উল্লেখ করা থাকে। ম্যাপের দুই স্থানের ব্যবধানের সঙ্গে সেই দুই স্থানের বাস্তবিক সমতল ব্যবধানের যে অনুপাত তাকে ম্যাপের মাপন চিহ্ন বা স্কেল বলে। ম্যাপের কাগজের ওপর দুই স্থানের দূরত্ব যদি এক ইঞ্চি হয় এবং সেই স্থানের আসল জমির দূরত্ব যদি ১ মাইল হয় তা হলে ঐ ম্যাপের স্কেল হবে ১" = ১ মাইল। অর্থাৎ ম্যাপে আঁকা এক ইঞ্চি দূরত্ব চলতে ১ মাইল আসল দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

এখন ১মাইল = ১৭৬০ গজ = ১৭৬০ × ৩ ফুট = ১৭৬০ × ৩ × ১২ ইঞ্চি

= ৬৩৩৬০ ইঞ্চি।

ম্যাপের স্কেল ১" = ১ মাইল না লিখে আর এক রকম ভাবে আনুপাতিক হারে তা বলা যায়। তা হল ম্যাপের মাপ ঃ জমির মাপ = ১ ঃ ৬৩৩৬০ অথবা তুলনামূলক বা আনুপাতিক ভগ্নাংশ (Representative Fraction বা সংক্ষেপে R. F) এভাবে হলে ১" = ১ মাইল না লিখে লিখতে হবে স্কেল ১/৬৩৩৬°।

ম্যাপেতে তিন রকমভাবে চিহ্ন বা স্কেল দেখান হয়

(ক) লিখে দেওয়া হয় স্কেল ১" = ১ মাইল

(খ) স্কেল ১/৬৩৩৬০

(গ) জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ম্যাপের কোনও ফাঁকা কোণে স্কেল এঁকে।

একটি সরলরেখা তা ম্যাপের নির্দিষ্ট মাপের সমান করে কয়েকটি ভাগ করা হয় (ম্যাপের এক মাইল/এক কিলোমিটার বা ঐ জাতীয় কোনও একক স্কেলের একভাগের সমান)। শূন্য থাকে প্রথম ভাগের পর। শূন্যের বাঁদিকে যে ভাগ থাকে সেগুলি আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। সুবিধার জন্য সাধারণত এগুলি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দশের এককে করা হয়। ম্যাপে কী কী রকম স্কেল হবে তা সাধারণত নিচে প্রদত্ত বিষয় গুলির ওপর নির্ভর করে।

ক) কতখানি স্থানের ম্যাপ তৈরী করতে হবে।

খ) কতটুকু কাগজের মধ্যে ম্যাপ আঁকতে হবে।

গ) কত বিশদ বিবরণ দিতে হবে।

ব্যবহার সিদ্ধ চিহ্ন (Conventional Sign)

ম্যাপগুলিতে রাস্তা, নদী, সেতু, বন, রেললাইন এসবের জন্য কিছু বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই চিহ্নগুলিকেই ব্যবহার সিদ্ধ চিহ্ন

(Conventional Sign) বলা হয়। এগুলি সাধারণত সকল ম্যাপের ক্ষেত্রেই একরকম হয়। ইচ্ছেমত ছবি এঁকে বসান হয় না, বা একেক ম্যাপের এক এক

ব্যবহারসিদ্ধ চিহ্ন ঃ—
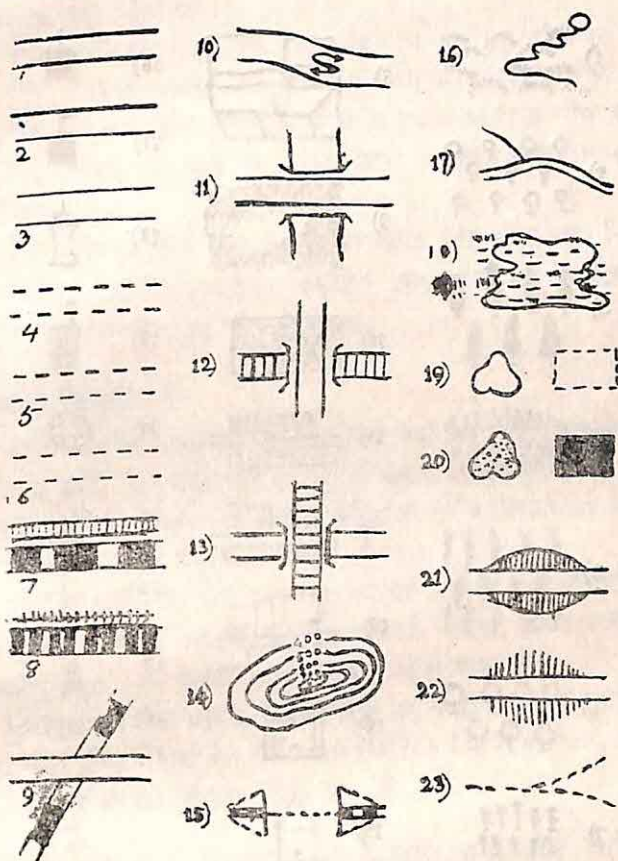
1; 2, 3) সীমা রেখা সহ ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর রাস্তা ; 4, 5, 6) সীমারেখাহীন ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীর রাস্তা ; 7, 8) রেল লাইন ডবল ও সিঙ্গল ; 9) লেভেল ক্রসিং ; 10) নদী, জোয়ার ভাঁটা হয় ; 11) সেতু, নিচে নদী ; 12) সেতু, নিচে রেল লাইন ; 13) রেল সেতু, নিচে রাস্তা ; 14) কনটুর চিহ্ন ; 15) সুড়ঙ্গ ; 16) ঝর্ণা ; 17) শাখা সহ নদী ; 18) জলাভূমি ; 19) পুকুর বা হ্রদ — শুকিয়ে যায় ; 20) পুকুর বা হ্রদ — কখনও শুকোয় না ; 21) কাটিং ; 22) বাঁধ ; 23) মেঠো পথ।

রকমের হয় না। সরকারী সার্ভে ম্যাপের এক কোণে এই সব চিহ্নের একটি

তালিকা সব সময় দেওয়া থাকে।

ব্যবহারসিদ্ধ চিহ্ন ঃ—
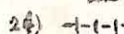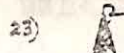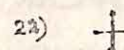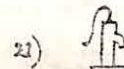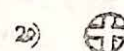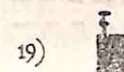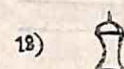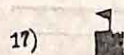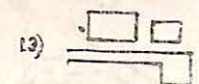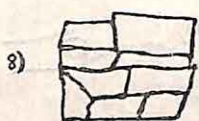
1) তৃণভূমি ; 2) ফলের বাগান ; 3) পাইন জাতীয় গাছ ; 4) ধান ক্ষেত ; 5) জঙ্গল ; 6) চির সবুজ গাছ ; 7) তাল নারকেল জাতীয় গাছ ; 8) জমি ; 9) বালিয়াড়ি ; 10) ঘেরা বাগান ; 11) সুরক্ষিত গ্রাম ; 12) অরক্ষিত গ্রাম ; 13) ছড়ান গ্রাম ; 14) মসজিদ ; 15) মন্দির ; 16) গীর্জা ; 17) স্কুল ; 18) প্রাচীন স্তম্ভ ; 19) থানা ; 20) হাসপাতাল ; 21) নলকূপ ; 22) প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ; 23) বেতার স্তম্ভ ; 24) টেলিফোন লাইন ; 25) টেলিগ্রাফ লাইন ; T-টেলিফোন বুথ ; T. P.-ডাক ও তার ঘর ; W-পাতকুয়া, P-ডাকঘর, STA-রেল স্টেশন।

সরকারী সার্ভে-ম্যাপে সুবিধার জন্য কতকগুলি রঙ ব্যবহার করা হয়। এই সব রঙগুলির প্রত্যেকটির আলাদা অর্থ আছে।

(ক) মানুষের তৈরী কাজ যেমন শহর, রেল লাইন, ঘড়বাড়ি, সেতু ইত্যাদি কাল রঙ দিয়ে আঁকা হয়।

(খ) নদী, নালা, হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদি নীল রঙ দিয়ে আঁকা হয়।

(গ) পাহাড়, পর্বত, মালভূমি ইত্যাদি বাদামী রঙ দিয়ে আঁকা হয়।

(ঘ) জঙ্গল তৃণভূমি, গাছপালা ইত্যাদি সবুজ রঙ দিয়ে আঁকা হয়।

(ঙ) দূরপাল্লার সড়ক পথ (Highway) আঁকার সময় লাল রঙ ব্যবহার করা হয়।

রেললাইন বা রাস্তা আঁকার সময় সাধারণত তার সীমা রেখা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এগুলির একদিকে লেখা থাকে কোথা থেকে আসছে ও অন্যদিকে লেখা থাকে তা কতদূরে যাচ্ছে।

লেয়ার সিসটেম :

ম্যাপে অসমতল জায়গাগুলিও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেখান হয়ে থাকে।

স্কুল পাঠ্য ভূগোলের ম্যাপগুলিতে এগুলি আমরা দেখেছি। সেখানে সমুদ্রের গভীরতম স্থান থেকে এভারেষ্টের চূড়া পর্যন্ত উচ্চতার এই বিভিন্ন স্তর-গুলি নানা রকম রঙ দিয়ে নির্দেশ করা থাকে।

সমুদ্রের গভীরতম অংশ ঘন নীল, কম গভীর অংশ ফ্যাকাশে নীল, সমুদ্র-তীর সাদাটে নীল। এর পর সমুদ্রের পৃষ্ঠতল সবুজ, ক্রমশ হলুদ, লালচে বাদামী, বাদামী, ঘন বাদামী আর বরফজমা চূড়া সাদা রঙ।

ম্যাপের ধারে বা কোণে রঙের স্তর দিয়ে এই উচ্চতা সম্পর্কে একটি তালিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এই রঙ ব্যবহারের পদ্ধতিকে Layer system বা উচ্চতা অনুসারে রঙ-এর স্তর বিন্যাস পদ্ধতি বলে।

হ্যাচিওরিং : শুয়োপোকার গায়ের মতো ভাঙালাইন দিয়েও ম্যাপে

উচ্চতা বোঝান হয়, তাকে হ্যাচিওরিং Hachuring বলে।

স্পট লেভেল : *ম্যাপে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা সংখ্যা দিয়ে লিখে* দেখান হয়ে থাকে তাকে Spot level বলে।

কনটুর : এছাড়া আছে কনটুর (Contur)। কনটুর একধরণের কাল্পনিক রেখা। এই রেখা ম্যাপে সমউচ্চ জায়গাগুলি সংযুক্ত করে। কোনও নির্দিষ্ট কনটুর রেখায় ওপর সকল স্থানের উচ্চতা এক। সুতরাং ম্যাপে গাঢ় বাদামী রঙে ছাপা এই রকম রেখা আর তার পাশের সংখ্যা দেখে সহজেই ম্যাপের চিহ্নিত জায়গার উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।

ছবিটি দেখে খুব সহজেই বোঝা যায় কনটুর কেমন ভাবে আঁকা হয়। এক্ষেত্রে ৪000 ফুট উচ্চতার একটি পাহাড়, অন্য আরও কিছু পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি হ্রদের মধ্যে দ্বীপের মত রয়েছে। এখন এই পাহাড়ের গায়ে হ্রদের জলের যে রেখা সৃষ্টি হয় তাই প্রথম কনটুর রেখা মনে করা যায়। এখন যদি কোনও কারণে হ্রদের জল বৃদ্ধি হয় তবে জলের তল উপরে উঠে যাবে এবং নতুন দাগের সৃষ্টি হবে। এবং প্রতি ১000ফুট জল উঁচুতে ওঠার সঙ্গে যদি পাহাড়ের গায়ে দাগের সৃষ্টি হয় তবে তা ক্রমশ ছোট হতে হতে পাহাড়ের চূড়া ছোট্ট দ্বীপের মত দেখাবে। এই রকম বিষয় মাথায় রেখে কনটুর আঁকা হয়। মাইথনে এই রকম পাহাড় আছে। এবং তা দেখলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।
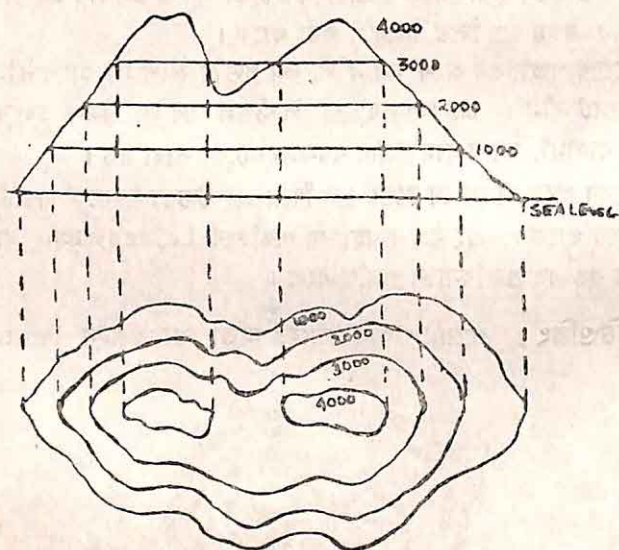
কনটুর রেখা কাছাকাছি থাকলে ভূমির চড়াই বেশী আর দূরে থাকলে কম। সেই কারণে কনটুর ম্যাপ দেখে পাহাড়ী রাস্তায় চলার পথ ঠিক করার সময় খাড়া চড়াই পথ এড়িয়ে চলার জন্য যেখানে কনটুর রেখা খুব ঘেঁযাঘেঁষি নয় সেই

রাস্তা বাছাই করতে হয়। সবচেয়ে উঁচু চূড়া একটি বিন্দু বা ত্রিভুজ অথবা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা থাকে। সেখানে উচ্চতাও লেখা থাকে। এই উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ধরা হয়। ভাঁটার সময় সমুদ্রের জল যেখানে নেমে যায় আর জোয়ারের সময় জল যত উঁচু হয়ে ওঠে তার মাঝামাঝি উঁচু জায়গাকে সমুদ্র পৃষ্ঠ ধরা হয়।

গ্রীড (Grid) ঃ অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ কথা দুটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। পৃথিবীর ম্যাপকে উত্তর দক্ষিণ আর পূর্ব পশ্চিমে ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করে কাল্পনিক চৌকো খোপে খোপে ভাগ করা থাকে। এই চৌকো খোপগুলিকে গ্রীড বলে। সামরিক ম্যাপের গ্রীড বিশেষ কোড (Code) বা সাংকেতিক অক্ষরের হয়। প্রতিটি ম্যাপের নির্দিষ্ট স্থান গ্রীডের সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ভাল ম্যাপ বইতে সবসময় পিছনের দিকের সূচীপত্রে (General Place Index) শহরের নাম গ্রীড চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়। কলকাতার ক্ষেত্রে দেখা যাবে লেখা আছে Calcutta (West Bengal) India, 2234 N, 8824 E, অর্থাৎ কলকাতার গ্রীড নং ২২৩৪ উঃ ৮৮২৪ পূঃ।

কোনও ম্যাপ সবিস্তারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আঁকতে হলে তা বড় করে আঁকা দরকার। সুবিধার জন্য তখন তা আর একটি কাগজে আঁকা সম্ভব নয়। ছোট ছোট অংশে আঁকতে হয়। এই কারণে ম্যাপের ক্রমিক সংখ্যা রাখতে হয়। এই থেকে **ম্যাপের সীট নম্বর, সার্কেল নম্বর** এসবের সৃষ্টি হয়েছে।

কী ভাবে ম্যাপ নকল করতে হয় ঃ

এটি একটি ট্রেকারদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অভিযানের জন্য ট্রেকারদের ম্যাপের প্রয়োজন হয়। দলে অনেক সদস্য থাকে। সকলের জন্যই একটি আলাদা ম্যাপের প্রয়োজন। এবং তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিজের কাছে রাখতেই হবে।

ম্যাপ নকল করার সময় যে ম্যাপ নকল করতে হবে তা হাল্কা পেনসিলের দাগ দিয়ে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি চৌকো ঘরের খুপি দাগ দিয়ে তার পর অন্য সাদা কাগজে চৌকো ঘর কেটে গ্রীড করে নিতে হবে। যদি ম্যাপ সমান মাপের করতে হয় তবে কাগজের চৌকো দাগ ও ম্যাপের চৌকো দাগ সমান হবে। যদি ম্যাপ ছোট করতে হয় তবে ম্যাপের চৌকো ঘর অপেক্ষা কাগজের চৌকো ঘর মাপে ছোট করতে হবে। আর যদি ম্যাপ বড় করতে হয় তবে ম্যাপের চৌকো ঘর অপেক্ষা কাগজের ওপর আঁকা চৌকো ঘর বড় হবে। এরপর ম্যাপের চৌকো যে ঘরে (গ্রীড) যে ছবি আছে তা ম্যাপ আঁকার সাদা কাগজে সেই রকম ভাবে সেই ঘরে আঁকতে হবে। ব্যবহার সিদ্ধ চিহ্নগুলি ছোট বড় না করে একই

ম্যাপের থাকবে। ম্যাপ কাগজে আঁকা হয়ে গেলে তা ট্রেসিং ক্লথে স্থায়ী কালি দিয়ে এঁকে নিলে তা অভিযান বা ট্রেকিং-এর সময় ব্যবহার করা যাবে।

ট্রেকিং বা পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রে ভাল ম্যাপ দেখতে জানা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রে যে প্রশিক্ষণ হয় তাতে ম্যাপ-রীডিংকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমস্যা হল এটি নিজেই একটি বিরাট বিষয়। শুধু ম্যাপ রীডিং-এর ওপরেই চার পাঁচ দিনের জমাট ক্যাম্প হতে পারে।

বর্তমান আলোচনায় ম্যাপ সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ঠ নয়। যাই হোক, ট্রেকারদের উচিত নিজেদের উদ্যোগে ভাল ম্যাপ রীডিং জানেন এমন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে বারে বারে বিষয়টি শিখে নেওয়া। এবং অবসর সময়ে নিজেই বিষয়টি অনুশীলন করা। কার কাছে ম্যাপ রীডিং শেখা যাবে সে বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক মাত্র ভূগোলের শিক্ষকরা ভাল ম্যাপ দেখতে জানেন এই ধারণা ভুল। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ভূগোলের ছাত্র না হয়েও ম্যাপ রীডিং ভাল জানেন বা বোঝাতে পারেন। অবশ্য এটা ঠিক যে ভূগোলের ছাত্র হলে একটা সুবিধেজনক পরিস্থিতি প্রশিক্ষকের থাকে।

ভাল ম্যাপ পাওয়াও একটি সমস্যা। বিশেষ অঞ্চলের বিশদ সার্ভেম্যাপ পাওয়া গেলে তা সবচেয়ে উপযোগী।

কম্পাস ম্যাপ রীডিং এর একটি অপরিহার্য উপাদান।

ফিল্ড বুক ঃ—ট্রেকিং বা অভিযান চলার সময় অভিযাত্রীরা এক বিশেষ পদ্ধতিতে ম্যাপ আঁকতে আঁকতে চলে। এই ম্যাপ দেখতে সাধারণ ম্যাপের চেয়ে আলাদা। ট্রেকার খাতার পাতায় ভাঁজ দিয়ে লম্বালম্বি তিন কলমে ভাঁজ করে। পাতার নিচের লাইন থেকে ক্রমশঃ ওপরের দিকে ব্যবহার করা নিয়ম। এক্ষেত্রে দুধারে অর্থাৎ (১নং ও ৩নং কলমে) টুকরো টুকরো ম্যাপ এঁকে রাস্তার মোড় বাঁক, ব্যবহার সিদ্ধ চিহ্ন, বিয়ারিং (অর্থাৎ সেই স্থান থেকে —উত্তর কত ডিগ্রী কোণে বা সোজা কথায় সেই স্থান থেকে উত্তর দিক কোন দিকে), কোন দিকে রাস্তা চলেছে, রাস্তার দুদিকের লক্ষ্যণীয় বস্তুর ছবি—এসব আঁকতে হয়।

মাঝের কলমে (২নং) কতটা দূরত্ব পার হওয়া হল, প্রতিটি বিশেষ কম্পাস বিয়ারিং, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খবর লিখতে হবে।

পথ চলার সময় গজ ফিতে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। রাস্তায় সবসময় মাইল-ষ্টোন ইত্যাদি থাকে না তাই নিজের সম্পর্কে কতগুলি ধারণা থাকলে ভাল হয়।

ক) ১০০ ফুট হাঁটতে নিজেকে কতগুলি পা ফেলতে হয়।

খ) ১০০ মিটার হাঁটতে কতগুলি পা ফেলতে হয়।

গ) ১ মাইল / ১ কিমি হাঁটতে কতক্ষণ সময় লাগে।

যে খাতায় অভিযাত্রী এই ম্যাপ তৈরী করবে তা যদি লাইন টানা খাতার পাতা হয় তবে একটু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটি লাইনকে যদি একটি বিশেষ দূরত্বের মাপ ধরে নেওয়া যায় তবে কাজ অনেক সহজ হয়।

এই বিশেষ ম্যাপের মাঝ কলমে ছোট করে অভিযানের বিবরণ আবহাওয়া লিখে রাখলে, এবং ম্যাপ শুরুর পাতায় কে কবে কত তারিখে কোন অভিযানে, কোন মূল ম্যাপের সাহায্য নিয়ে অভিযান বা পর্বত পদযাত্রা করেছে, তা লিখে রাখলে অভিযানের পূর্ণ বিবরণ বা লগ (Log) লেখা হয়ে যাবে। এই তিন কলম পদ্ধতিতে ম্যাপ আঁকা আর বিবরণ লেখাকে ফিল্ড বুক (Field Book) পদ্ধতি বলে।

ট্রেকিং-এর সময় পথ চেনা যেমন প্রয়োজন তেমনি পাহাড় বা জঙ্গলে পথ হারানোও বিচিত্র নয়। এমনটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে ম্যাপ আর কম্পাসের সাহায্য নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার করার কৌশল জেনে রাখা অপরিহার্য। তাই ম্যাপ রীডিং শিখতে হবে। নিজে নিজে ম্যাপ আঁকা শুরু করলে ব্যাপারটা অনেক বেশি পোক্ত হয়। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ্যালিডেড (Alidade) থিওডোলাইট, সার্ভে টেবিল, চেন এই সব খটমট সার্ভেয়ারদের যন্ত্রপাতি ছাড়াও শুধু মাত্র সমতল টেবিল, এক ফুটের সোজা স্কেল, কম্পাস, বোর্ডপিন, মাথাওয়ালা লম্বা আল পিন, পেন্সিল, ইরেজার কাগজ নোট বই এগুলি নিয়েই কোনও জায়গার ম্যাপ নিজে নিজে আঁকা যায়।

এই ম্যাপ আঁকার ব্যাপারটা আনন্দদায়ক করে তুলতে এবং এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে ট্রেকাররা অবসর সময়ে এটাকে খেলার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। আর এই ম্যাপ আঁকা নিয়ে সত্যি সত্যিই অনেক মজার খেলা-তৈরী করা যায়।

কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয় ঃ

বিশেষ পরিস্থিতিতে কম্পাস না থাকলেও কয়েকটি সহজ উপায়ে দিক নির্ণয় করা সম্ভব।

সূর্যের সাহায্যে ঃ সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। পূর্বে মুখ করে দাঁড়ালে আমাদের ডান দিক দক্ষিণ বাঁ দিক উত্তর দিক।

হাত ঘড়ির সাহায্যে ঃ সূর্য আকাশে আছে অথচ দিক বোঝা যাচ্ছে না এমন সময়ে আমাদের গোল ডায়াল ওয়ালা হাত ঘড়ি দিক নির্ণয়ে সাহায্যে করতে পারে।

প্রথমে হাতের ঘড়িটি খুলে নিয়ে একটা সমতল জায়গায় রাখতে হবে। একটা কাঠি ঘড়ির গায়ের পাশে লম্বভাবে রাখলে কাঠির ছায়া ঘড়ির উপর পড়বে।

এবার ঘড়িটি ঘুরিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ঐ কাঠির ছায়া ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার ওপর বরাবর পড়ে। এর অর্থ ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা সূর্যের দিকে মুখ করে অবস্থান করবে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ঘণ্টার কাঁটা এবং ঘড়ির ১২টা দাগের মধ্যে যে স্থূল (বড়) কোণ হবে সেই কোণটিকে দ্বিখণ্ডিত করলে দ্বিখণ্ডক সরল রেখা উত্তর দিক নির্দেশ করবে।

লাঠি, দড়ি ও ছোট খোঁটার সাহায্যে ঃ

আকাশে সূর্য থাকলে লাঠি, দড়ি আর কয়েকটি ছোট খোঁটা থাকলে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শুধু সকালের দিকে (বেলা ১২টার আগে) অর্থাৎ সূর্য মাঝ আকাশ পার হবার আগে দিক নির্ণয় করতে সুবিধা।

একটি লাঠি মাঠের মাঝে কোনও খোলা জায়গায় প্রথমে লম্বভাবে পুঁতে দিতে হবে। মাটিতে যেখানে লাঠির মাথার ছায়া পড়বে সেখানে একটা দড়ি নিয়ে তার এক প্রান্ত লাঠির গোড়ায় বেঁধে ছায়ার দূরত্ব অর্থাৎ যেখানে খোঁটা পোঁতা হয়েছে, সেটির ব্যাসার্দ্ধ ধরে মাটিতে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। সূর্য যত মাথার উপরে উঠবে লাঠির ছায়া ক্রমশঃ ছোট হতে থাকবে। ক্রমে সূর্য মাঝ আকাশে উঠে পশ্চিমে নামতে থাকবে। লাঠির ছায়াও বড় হবে। এবং শেষে লাঠির ছায়া আবার বৃত্তকে স্পর্শ করবে। ঠিক সেই বিন্দুতে আরও একটি ছোট খোঁটা পুঁততে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খুঁটির ঠিক মাঝখানে আরও একটা ছোট খোঁটা পুঁততে হবে। লাঠির গোড়ায় বাঁধা দড়ি টান টান করে তৃতীয় খোঁটাটিতে বাঁধলেই এক ধরণের কম্পাস তৈরী হল। দড়ির দক্ষিণে লাঠি আর উত্তরে খোঁটা। অবশ্য এ কম্পাস নিয়ে পথ হাঁটা চলবেনা।

ধ্রুবতারার সাহায্যে ঃ

ধ্রুবতারা সব সময় আকাশের উওর দিকে থাকে। অন্য সব গ্রহতারা আকাশে নড়াচড়া করলেও ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে সব সময় সব ঋতুতে স্থির থাকে। তবে ধ্রুবতারা চিনতে হবে। তারাটি খুব বড় আকারের বা খুব উজ্জ্বল বা দ্যুতিময় নয়। তবে খালি চোখে ভালই দেখা যায়। চিনতেও অসুবিধা হয় না। সপ্তর্ষি বা কালপুরুষ প্রভৃতি তারা মণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারাকে চেনা সহজ। যারা তারা'মণ্ডল চেনেন তাঁদের কাছ থেকে এগুলি চিনে নিতে হবে।

যে কোনও তারার সাহায্যে ঃ—

যখন আকাশে পরিচিত তারামণ্ডল পাওয়া যাবেনা তখনও উত্তর দিক বের করে নেওয়া যায়। আর তা যে কোনও তারার সাহায্যে। এর জন্য খোলা পরিষ্কার আকাশ, ফাঁকা মাঠের মতো কিছু খোলা জায়গা আর দুটি লাঠি থাকলেই হবে (একটি ছোট আর একটি বড়)।

প্রথমে বড় লাঠিটা লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। তার একটু দূরে ছোটো লাঠিটিও অনুরূপ ভাবে পুঁতে দিতে হবে। এর পর দুটি লাঠির মাথা বরাবর নিজের দৃষ্টিকে সরল রেখায় নিয়ে এসে যে কোনও একটি তারাকে লক্ষ্য করতে হবে। কিছু সময় পর একই ভাবে তারাটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা কোনও একটি দিকে সরে গেছে। এখন যদি উপর দিকে সরে যায় তবে দর্শকের সামনের দিক পশ্চিম। ডান দিকে সরে গেলে দক্ষিণ, আর বাঁদিকে সরে গেলে দর্শক উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে হবে।

অন্য প্রথা ঃ—মুসলিমদের কবর, ঈদগাহ, মসজিদ ইত্যাদি দেখেও দিক নির্ণয় সম্ভব। মসজিদের ভিতরের উপাসনার বেদী ঘরের পশ্চিম দিকে থাকে। করবের মাথা পশ্চিম দিকে থাকে। ঈদগাহের উপাসনার বেদীও ময়দানের পশ্চিম দিকে থাকে।

পথ চলার সময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান চিহ্নগুলি (Land Mark) সব সময় লক্ষ্য রাখা দরকার। এতে দিক ভুল হবার সম্ভাবনা কমে।

উড্ ক্র্যাফ্ট সাইন ও এস্টিমেশন
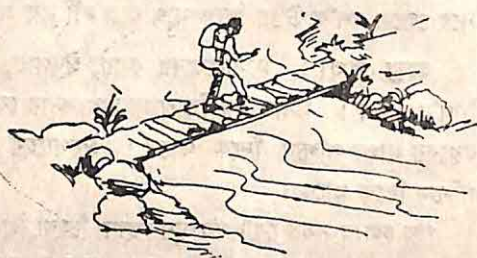
ট্রেকিং-এর সময় দেখা যায় সকাল বেলা দলের সকলে এক সঙ্গে পথ চলতে শুরু করলেও কিছু সময় পরেই দলটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে। আবার কেউ হয়তো একাই পথ চলেছে।

যদিও ট্রেকিং এর সময় দলের সকলে এক সঙ্গে পথ চলাই নিয়ম। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় তা সম্ভব হয় না। নানা কারণে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল সদস্যদের আস্তে বা জোরে পথ চলা। ব্যক্তিগত গতিবেগ, শক্তি ও সামর্থের ওপর এই চলা নির্ভর করে। একা কখনই পথ চলা উচিত নয়। তবুও বাস্তব বাস্তবই। এমন ঘটনা ঘটে যায়। চলার পথে পাহাড় বা জঙ্গলে এই বিচ্ছিন্ন দলগুলি অথবা একাকী পথ চলা ব্যক্তির মধ্যে গ্যাপ বা দূরত্ব বেশি হয়ে গেলেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন পশ্চাদগামী ব্যক্তি বা দলের পক্ষে নির্জন পাহাড় বা জঙ্গলের পথে কিছুতেই আন্দাজ করা সম্ভব নয় অগ্রগামী দল কোন পথে যাচ্ছে। ফলে পশ্চাদগামী দলগুলি বা একাকী পথ চলা সদস্যটি সহজেই মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভুল পথে চলে যেতে পারে, এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

এখন এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের উপায় কী। উপায় একটাই, আর তা হল

অগ্রগামী দলটি তাদের যাত্রা পথ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পথ চলতে চলতে পশ্চাদগামী দল বা সদস্যের জন্য পথেই রেখে যাবে। চিঠি লিখে রেখে যাবে কি? অসম্ভব। অত কথা লেখার সময় কোথায়? তা ছাড়া ব্যাপারটাও খটমট। কোথায় চিঠি রাখবে? বাতাসে সে চিঠি উড়েও যেতে পারে। তখন খুঁজে পাওয়া শক্ত। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ট্রেকার বা মাউণ্টেনিয়াররা উড্‌ক্র্যাফ্‌ট চিহ্ন বা সাইন ব্যবহার করে থাকে। উড্‌ক্র্যাফ্‌ট সাইন মারফত যে পথ-নির্দেশ দেওয়া হয় তা ভাষায় লেখা হয় না। কিছু কিছু চিহ্ন পথের মাঝে রেখে যাওয়া হয়। সেগুলি দেখে পশ্চাদগামী সদস্যেরা বুঝতে পারে অগ্রগামী দলটি কোন পথে গেছে। পথে পানীয় জল পাওয়া যাবে কিনা, অথবা পথে কোনও বিপজ্জনক কিছু আছে কিনা, ইত্যাদি।

এই চিহ্নগুলির বিশেষত্ব আছে। অর্থাৎ আবোল তাবোল বা যাহোক তাহোক কিছু রেখে গেলে চলবেনা। সকলেই যাতে বুঝতে পারে এমন বিশেষ কিছু চিহ্ন এর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই উড্‌ক্র্যাফ্‌ট সাইন, ও স্কাউটরা যে উড্‌ক্র্যাফট সাইন ব্যবহার করে থাকে তা এক।

স্কাউটদের কাছে উড্‌ক্র্যাফ্‌ট হল, প্রকৃতি ও প্রাণী জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে স্বাভাবিক পরিবেশে পশুপাখীর বিচরণ, তাদের জীবন যাত্রার অভ্যাস লক্ষ্য করতে করতে পথ চলা এক দারুন রোমাঞ্চকর আর আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে পদচিহ্ন, অবিন্যস্ত ঝোপঝাড়, ভাঙা গাছের ডাল বা এই ধরণের আপাত তুচ্ছ বিষয়গুলি নজর করতে পারা এবং তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারার শক্তি অর্জন করতে হয়। যা তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব। এই ব্যাপারটা একদিনে হয় না। বার বার অনুশীলন করে আয়ত্ব করতে হয়। স্কাউটদের এই কারণে মাঝে মাঝেই উড্‌ক্র্যাফ্‌ট ট্রেনিং হয়। এই ট্রেনিং তাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি শক্তি বা পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন করে তুলতে সাহায্য করে। একজন প্রকৃত স্কাউট এই কারণেই তার পরিবেশ সম্পর্কে সব সময় সজাগ। তার চার পাশের প্রকৃতি, পশুপাখী গাছপালা, আবহাওয়া, ঘটনা, দুর্ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামান্যতম পরিবর্ত্তনের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণে সে সক্ষম।

ট্রেকার বা মাউণ্টেনিয়ারদেরও এই বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং তা তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থেই। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে কোথাও 'খুচ' করে একটি শব্দ এবং তা উপেক্ষা করলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। হয়তো এটি মাথার ওপর হঠাৎ কোনও পাথর স্থানচ্যুত হওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তেই যা বিরাট ধ্বসের আকার নিয়ে মাথার ওপরে নেমে আসবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। হালকা ভাবে দেখলে চলবেনা। তবে একটি কথা এই যে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটা

গুরুগম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ হলেও এমন নয় যে আয়ত্ব করা দারুন শক্ত।

উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে চোখ কান খোলা রেখে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পথ চললেই বোঝা যাবে ব্যাপারটি শক্ত তো নয়ই বরং উল্টোটাই। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মজা, আনন্দ আর উপভোগ করার দারুন সব ব্যাপার।

উন্মুক্ত প্রকৃতি, গাছপালা, পাহাড়, জঙ্গল, এসব আমাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে মূক, নীরব, ভাবলেশহীন। কিন্তু সত্যি সত্যি তা নয়। প্রকৃতি সব সময়েই মুখর, তার নিজস্ব ভাষায় সে সব সময়েই আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। সেই কথা বোঝার শক্তি প্রকৃতি আমাদেরও দিয়েছে। কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করিনা। আর তা ব্যবহার না করার ফলে. ধারাল অস্ত্রও যেমন অব্যবহারের ফলে ভোঁতা ও অকেজো হয়ে যায়, আমাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে আছে। সামান্য চেষ্টার ফলে আমাদের এই ভিতরের শক্তিকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। আর তা পারলেই দেখা যাবে আমাদের চারপাশে এক অনাবিল আনন্দ, রোমাঞ্চ, আর অনুভূতিময় জগৎ ছড়িয়ে আছে। সে জগৎ আমাদের চেনা জানার বাইরে।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে বুশ-রিডিং-এর কথা। এই প্রকৃতি পড়ুয়াদের কাছে পাহাড়-জঙ্গল সব সময় মুখর। হয়তো অভিযাত্রীরা জঙ্গলের কোনও নালা অতিক্রম করতে উন্মুখ। সুন্দর স্বচ্ছ জলের ধারা। তির তির করে বয়ে চলেছে। কোন বিপদের ছায়া মাত্র নেই কোথাও। কিন্তু বাধা এল গাইডের কাছ থেকে। অভিযাত্রীরা অবাক। গাইড একটি ছোটখাট গাছের ডালের ভাঙা অংশ জলে ছুঁড়ে দিলেন। আর যায় কোথা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জল থেকে বিরাট হাঁ করে লাফিয়ে উঠলো একটি কুমির। পরক্ষণেই সেটা মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন ঘটনা আফ্রিকার জঙ্গলে ঘটেছে। বুশ-রিডারদের কাছে পাহাড়ী পথে চলতে চলতে পথের ওপর পড়ে থাকা সামান্য একটি পাখীর ছোট্ট নীল পালক ও অনেক কথা বলে। আপাত দৃষ্টিতে এটা হয়তো তেমন কোনও ঘটনাই নয়। সেটি হাতে তুলে নিতে দেখা গেল, তার গায়ে লেগে আছে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন। এই ছোট্ট রক্তের চিহ্ন কিন্তু ততক্ষণে অনেক অনেক কথা বলে দিয়েছে। এখন একটু সতর্ক দৃষ্টিতে কাছাকাছি তাকাতেই চোখে পড়বে পালকটি যেখানে পড়ে ছিল তার কাছাকাছি ঘাসের জঙ্গলে একটু ঝটাপটির চিহ্ন। অর্থাৎ কিছু ঘটনা সেখানেই ঘটেছে। এবার আরও একটু সতর্ক হয়ে আশপাশের বড় গাছগুলোর দিকে তাকালেই হয়তো চোখে পড়ে যাবে ডালের ওপর বসে আছে কোনও বিরল জাতের ঈগল বা বাজ পাখী। সঙ্গে তার সদ্য ধরা শিকার। একটি নীল রঙের পাখী।

পথ চলতে চলতে এই রকম হাজারটা জিনিস ট্রেকারদের চোখে পড়ে। তাই খেলার রাজা ট্রেকিং। যার যত বেশি পর্যবেক্ষণ শক্তি সে তত বেশি আনন্দের

ভাণ্ডার নিয়ে বাড়ী ফিরবে।

যাই হোক নিচে কতকগুলি উড্‌ক্র্যাফ্‌ট সাইন বা চিহ্ন দেওয়া হল। চিহ্নগুলি খুবই সাধারণ, সহজ সরল। সহজেই মনে থাকে।

এই চিহ্নগুলি যেমন পাথর, গাছের ডাল, ঝোপ বা তৃণের শীর্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুর সাহায্যে অথবা চক বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে পাথর বা গাছ ইত্যাদির গায়ে ছবি এঁকে বোঝান যায়।

উড্‌ক্র্যাফ্‌ট চিহ্ন (প্রাকৃতিক বস্তুর সাহায্যে বা ছবি এঁকে বোঝান যায়।)

এই পথে যাবে না

এই দিকে জল আছে

তীর চিহ্নিত পথে তিন পায়ের মধ্যে চিঠি আছে
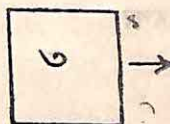
তীর চিহ্নিত পথে ৫ পায়ের মধ্যে চিঠি আছে
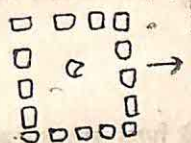
এই দিকে শিবির
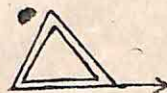
শিবির ছেড়ে চলে যাওয়া হয়েছে
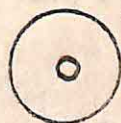
পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা কর
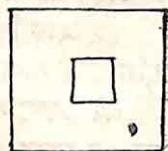
পানীয় জল

দূষিত জল

বিপদ
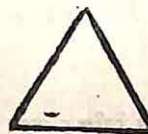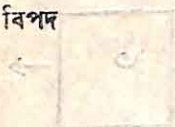
এই বাধা অতিক্রম কর
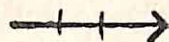
এই দিকে ভাল খাবার আছে

দূষিত খাবার

শত্রু

মিত্র >>>

ভাগ্য ভাল 卐

সোজা পথ দেখানোর সঙ্কেত

গাছ

পাথর

ঝোপ

ঘাস

তীর

ডান দিকে যাবার সঙ্কেত

গাছ

পাথর

ঘাস

ঝোপ
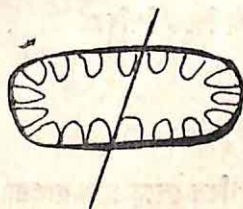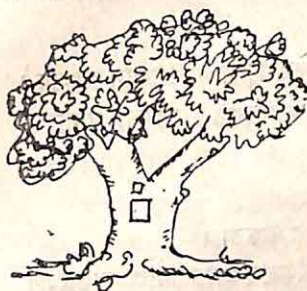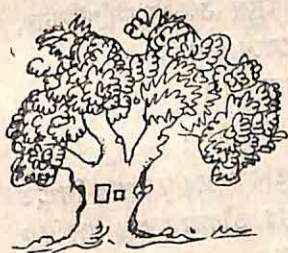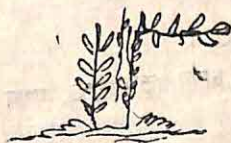
তীর

অনুমান (এস্টিমেশন)

পথ চলার সময় গজ ফিতে বা মাপার চেন নিয়ে পথ চলা সম্ভব নয়। অথচ ট্রেকারদের অনেক সময়েই দূরত্ব, উচ্চতা, তাপমাত্রা এসব মাপার প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু সহজ পদ্ধতি আছে যা জানা থাকলে প্রায় নিখুঁত হিসাব করে দেওয়া সম্ভব।

প্রতিটি ট্রেকার বা অভিযাত্রী তার নিজের কতকগুলি মাপ জেনে রাখবে। এগুলি কিছু দিন অন্তর অন্তর নতুন করে মাপা দরকার। কেননা মানুষের শরীরের মাপ পাল্টায়।

১। নিজের উচ্চতা।

২। পায়ের তলার মাটি থেকে নিজের চোখের উচ্চতা।

৩। হাত সোজা করে মাথার ওপর তুলে দাঁড়ালে মাটি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত উচ্চতা।

৪। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাটির সমান্তরালে দুপাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতের মাঝ আঙুলের ডগা থেকে ডান হাতের মাঝ আঙুলের ডগা পর্যন্ত মাপ।

৫। হাতের কনুই থেকে মাঝ আঙুলের ডগার মাপ।

৬। হাতের বিঘৎ (বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে কড়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত) মাপ।

৭। পায়ের পাতার মাপ।

৮। সাধারণ ভাবে হাঁটার সময় দুই পায়ের পাতার দূরত্ব।

৯। শরীরের কোন অংশ ঠিক এক ইঞ্চি, কোন অংশ ঠিক এক সেণ্টিমিটার, কোন অংশ এক ফুট। কোন অংশ এক মিটার, তা জেনে রাখা।

১০। একশ পা হাঁটলে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করা হয়।

১১। একশ পা দৌড়ালে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করা হয়।

অভ্যাস থাকলে কোন বস্তু কতটা দূরে অবস্থান করছে তা প্রায় নিখুঁত ভাবে অনুমান করা যায়। তবে আবহাওয়া, আলোর তীব্রতা বন্ধুর প্রাকৃতিক অবস্থান এগুলি অবশ্য আমাদের অনুমানে বিঘ্ন ঘটায়।

অনুমান বেশি হয়ে যাওয়ার কারণ—

১। যখন দর্শক আলোতে আর বস্তু ছায়াতে থাকবে।

২। বর্ষার মেঘলা দিনে অথবা শীতের কুয়াশায় ঢাকা ভূমিখণ্ডে, যখন বস্তু আবহাওয়ার জন্য পরিষ্কার দেখা যায় না।

৩। বস্তুর রঙ আর পশ্চাদভূমির রঙ এক হলে।

৪। অতি উজ্বল দিনের আলোয়।

৫। সূর্যের কিরণ পিছন থেকে পড়লে।

দূরত্ব মাপা ঃ ট্রেকিং-এর সময় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ প্রয়োজনে ছোটখাট কিছু মাপার দরকার হলে সবচেয়ে সুবিধা নিজের দেহের মাপ ব্যবহার করা। নিজের উচ্চতা, হাতের মাপ, বিঘৎ, পা ইত্যাদি, এগুলি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া লাঠি, দাঁড় বা হাতের যা কিছু মাপার জিনিস পাওয়া যায় তাই দিয়ে মাপা যায়।

দূরত্ব মাপার প্রয়োজনে নিজের হাঁটা বা দৌড়ানোর মাপ সবচেয়ে বেশি কাজ দেবে। এর জন্য নিজের চলার সময় এক পায়ের গোড়ালি থেকে আর এক পায়ের গোড়ালির দূরত্বের মাপ জেনে রাখতে হবে। এর সহজ উপায় আছে। একটি লাইন বরাবর ১০০ পা প্রথমে হেঁটে যেতে হবে। যেখানে একশ পা হাঁটা শেষ হল, যাত্রা শুরু থেকে সেই জায়গাটির দূরত্ব মেপে নিয়ে তাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করা হলে ভাগ ফল হবে যে হাঁটছে তার চলার মাপ (Pace)। একই ভাবে দৌড়ানোর মাপও (Pace) মেপে নেওয়া যায়। হাঁটা বা দৌড়ানোর মাপ (Pace) জানা থাকলে যে কোনও দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে আর অসুবিধা থাকার কারণ নেই।

এছাড়া নিজের হাঁটা বা দৌড়ানোর গতিবেগও জেনে রাখা দরকার। যে রাস্তায় মাইল/কিলোমিটার পোষ্ট আছে সেখানে ঘড়ি নিয়ে হেঁটে এই মাপ অনায়াসেই জেনে নিতে পারা যায়।

তবে পাহাড়ী পথ বিশেষ করে হাই-অলটিচিউড ট্রেকিং-এর সময় এই গতিবেগ কিন্তু কাজে লাগাবে না। সেখানে উচ্চতা জনিত শরীরের অবস্থা চড়াই-উৎরাই এসব কারণে সব কিছুই অন্য রকম হবে। এ বিষয় অবশ্যই ট্রেকারদের খেয়াল রাখতে হবে।

যাই হোক দূরত্ব অনুমান করতে হলে, এক ইঞ্চি কতটা, এক গজ কতটা, এক মিটার কতটা বা এক মাইল ও এক কিলোমিটার কতটা, তার একটা ধারণা নিজের থাকা প্রয়োজন।

মনে করা যাক স্বাভাবিক পরিস্থিতি আলো এবং আবহাওয়ার মধ্যে দুজন সাধারণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোক নিজেদের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এখন দূরত্ব অনুসারে তারা নিজেদের কী দেখবে তার আলোচনা করা যাক। ট্রেকিং-এ পথ চলার সময় কিন্তু এ রকম পরিস্থিতি হতেই পারে। যখন সাথী কতদূরে অবস্থান করছে তা জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

৫০ গজ দূরে দাঁড়ানো কোনও ব্যক্তির মুখ, চোখ আলাদা ও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে।
১০০ ,, ,, ,, ,, ,, চোখ বিন্দুর মতো দেখাবে।
২০০ ,, ,, ,, ,, ,, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিধেয় ব্যাজ ইত্যাদি আলাদাভাবে দেখা যাবে।
৩০০ ,, ,, ,, ,, ,, মুখ মণ্ডল আবছা হবে।
৪০০ ,, ,, ,, ,, ,, পায়ের নড়াচড়া বোঝা যাবে।
৫০০ ,, ,, ,, ,, ,, মাথা দেহ থেকে আলাদা ভাবে দেখা যাবে এবং জামা প্যাণ্টের রঙ বোঝা যাবে।
৬০০ ,, ,, ,, ,, ,, মাথা বিন্দুর মতো দেখাবে।
৭০০ ,, ,, ,, ,, ,, মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দেখতে কষ্ট হবে।

নদীর বিস্তার নির্ণয়ঃ পাহাড়ী পথে নদী বা নালা অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়। এগুলি পার হওয়ার পদ্ধতি আছে। তবে বিস্তার বা নদীটি কতটা চওড়া তা জানা থাকলে বাড়তি সুবিধা হয়। স্কাউটরা নেপো-লিয়ান পদ্ধতিতে খুব সহজেই ছোট নদীর বিস্তার মাপতে পারে। এই ক্ষেত্রে মাথার কানাৎওয়ালা টুপী পরা থাকলে সুবিধা হয়।

প্রথমে নদীর পাড়ে সমতল ভূমি বেছে নিয়ে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে হবে। তার পর মাথাটিকে নুইয়ে চিবুককে চেপে ধরতে হয়। এই সময় টুপীর কানাৎ এমন ভাবে নামাতে হবে, অথবা টুপী না থাকলে চোখের ভ্রূর কাছে হাত এমন ভাবে রেখে নদীর অপর পারের দিকে তাকাতে হবে, যাতে টুপীর কানাৎ বা হাতের পাতার শেষ প্রান্তের ছায়া অপর পারকে ছুঁয়ে আড়াল করেছে বলে মনে হয়। এরপর ডান বা বাঁদিকে যে দিকে খোলা সমতল ভূমি আছে, সে দিকে, রাইট বা লেফ্‌ট টার্ন করতে হবে, (ড্রিল করার পদ্ধতি) এবং টুপীর কানাৎ বা হাতের ছায়ার প্রান্ত ভূমিতে এমন ভাবে প্রতিফলিত করতে হবে যেন ভূমি নদী বিস্তারের দূরত্ব সামনের খোলা জমির উপর পরিবর্তন করে। এখন টুপীর কানাৎ বা হাতের পাতার প্রান্ত ছায়া যেখানে খোলা জমিতে ছুঁয়েছে দর্শকের কাছ থেকে সেই বিন্দুর দূরত্বই নদী বিস্তারের মাপ।

ওজন মাপার অনুমানঃ ঠিক মত ওজন অনুমান করার একমাত্র উপায় অভ্যাস। বিভিন্ন মাপের ওজন হাতে নিয়ে ভার পরীক্ষা করে নিজের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি করা যায়। রোজ বাজার করা যাদের অভ্যাস তাদের মধ্যে অনেক সময় এই ধারণা আপনা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে শরীর অসুস্থ

বা অবসন্ন থাকলে একই ভার অনেক বেশি মনে হয়। আবার ব্যায়ামের পর একই ভার কম বলে মনে হয়।

উচ্চতা নির্ণয়ঃ গাছ ইত্যাদির উচ্চতা কাঠুরিয়াদের পদ্ধতিতে সহজেই মাপা চলে।

হাত সামনের দিকে সোজা করে বাড়িয়ে এমনভাবে একটা বড় কাঠিকে লম্ব-ভাবে ধরতে হবে যেন তার ছায়া গাছটিকে ঢেকে ফেলে। এই ধরা এমনভাবে হওয়া উচিত যেন কাঠির মাথা গাছটির মাথা পর্যন্ত ঢাকে আর যে ব্যক্তি কাঠিটিকে ধরে আছে তার হাতের বুড়ো আঙুলের প্রান্তের ছায়া যেন গাছের গোড়া পর্যন্ত ঢাকে। এরপরে কাঠিটিকে সমকোণে পাশের দিকে ঘোরাতে হবে। এই সময় সাবধানে হতে হবে যাতে শুধুমাত্র হাতের কব্জি ছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশ বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করে। এখন কাঠির মাথার ছায়া যে জায়গায় ভূমিতে (কাল্পনিক ভাবে) স্পর্শ করে গাছের গোড়া থেকে সেই বিন্দুর দূরত্বই গাছের উচ্চতা।

ছায়া পদ্ধতিতে উচ্চতা মাপা

দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকলে গাছ ইত্যাদির ছায়া মাটিতে পড়ে। সেই ছায়ার সাহায্যেও গাছের উচ্চতা মাপা যায়। প্রথমে গাছটির ছায়া মেপে নিতে হবে। এরপর একটি লাঠি মাটির ওপর লম্ব ভাবে দাঁড় করিয়ে তার যে ছায়া মাটিতে পড়েছে তা মেপে নিতে হবে। এবং লাঠিটিরও মাপ নিতে হবে।

$$\text{গাছের উচ্চতা} = \frac{\text{গাছের ছায়ার মাপ} \times \text{লাঠির মাপ}}{\text{লাঠির ছায়ার মাপ}}$$

একটি ছোট বাটিতে বা পাত্রে অস্বচ্ছ জল (ঘোলা) গাছ ও দর্শকের মধ্যে রাখতে হবে। এখন দর্শক মাটি থেকে তার চোখের উচ্চতার সমান যে দূরত্ব তা মেপে নিয়ে বাটি থেকে সরে দাঁড়াবে। এবার দর্শককে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাত্রের মধ্যে গাছের মাথার ছায়া দেখতে চেষ্টা করতে হবে। যদি দেখতে না পাওয়া যায় তবে উপরোক্ত নিয়মে পাত্রটিকে গাছের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না গাছের মাথার ছায়া দেখতে পাওয়া যায় এতক্ষণ এগিয়ে বা পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাত্র থেকে গাছের দূরত্ব গাছের উচ্চতা।

সময়ের মাপ অভ্যাসের সাহায্যে নিখুত সময় জ্ঞান আনতে পারা যায়। বিভিন্ন কাজে কত সময় ব্যয় হচ্ছে তা ঘড়ি দেখে বার বার নির্ণয় করে নেওয়া। সময়ের গতি সম্পর্কে সজাগ থাকা, এসব অভ্যাস করতে পারলে প্রায় ঠিক

সময় বলা সম্ভব।

সাধারণভাবে আমাদের নাড়ীর গতি মিনিটে ৭২ বার আর নিশ্বাস মিনিটে ২০ বার। এই হিসাব জানা থাকলে ছোট সময় বের করা সম্ভব।

তাপের অনুমান ঃ বিভিন্ন উত্তাপের গরম জলে হাত ছুঁইয়ে আর বারে বারে তার তাপ মাত্রা মেপে দেখে অভ্যাসের মাধ্যমে তাপের অনুমান সম্ভব। ১০০° C তে গরম জল ফুটে ওঠে O°.C তাপ মাত্রায় জল বরফে পরিণত হয়।

আবহাওয়া

শুধু পাহাড় পর্বত নয়, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনেও যদি আমাদের পথে বের হতে হয় তখন সকলেরই প্রথমে মনে হয়, দিনটা ভাল যাবে তো! আমরা আকাশের দিকে তাকাই। তেমন প্রয়োজন মনে করলে ছাতা নিয়ে বের হই।

ট্রেকিং মানে পথ চলা। সুন্দর আবহাওয়ায় পথ চলা সব চেয়ে নিরাপদ। আনন্দ দায়ক। কিন্তু সব সময় যে আবহাওয়া ভাল পাওয়া যাবে তার কোনও স্থিরতা নেই।

পাহাড়ের অধিক উচ্চতায় দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়। এর কারণ যে এনাবেটিক আর ডায়াবেটিক উইন্ড তা আগেই আলোচনা হয়েছে। কাজেই যাত্রা সকাল সকাল শুরু ও সকাল সকাল শেষ করা উচিত। তবুও মোটামুটি দিন কেমন যাবে একথা জানা থাকলে ভাল হয়। তাছাড়া ট্রেকিং যে সব সময়েই অধিক উচ্চতায় হতে হবে এমন কথাও সব সময় খাটে না।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি :

আবহাওয়া কেমন যাবে সে বিষয়ে সবচেয়ে ভাল ও সঠিক পূর্বাভাষ আমরা

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মারফত পেয়ে থাকি। এই বিষয়ে সবচেয়ে পরিচিত যন্ত্র ব্যারোমিটার। আবহাওয়া খারাপ হবার আগে ব্যারোমিটারের পারা নিচে নেমে যায়। এটি খুব দামী যন্ত্র নয়। সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে। দলের সঙ্গে একটি ব্যারোমিটার ট্রেকিং বা পর্বতাভিযান দলগুলির রাখা উচিত। আজকাল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পাওয়া যায় তা আরও অনেক বেশি নির্ভুল। সেই পূর্বাভাষ প্রতিদিন রেডিও বা টিভির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ট্রেকার বা পর্বতঅভিযাত্রীরা নিয়মিত সেই সংবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললে অনেক বিপত্তি থেকে নিস্তার পাবে।

পশুপাখীর আচরণ :

পশুপাখী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি তাদের সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারে।

পিঁপড়ে বা জলাভূমির কাছাকাছি থাকা কীটপতঙ্গ ও পশুপাখীরা অতিবৃষ্টি বা প্লাবনের সম্ভাবনা আগে থেকেই বুঝতে পারে। ব্যাঙেরা ডাকতে থাকে। পাখীরা তাদের বাসা উঁচু গাছের ডালে বদল করে। এবং তাদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়।

আবার আবহাওয়া ভাল থাকার সম্ভাবনা থাকলে এই সব কীটপতঙ্গ ও পশুপাখীর আচরণ অন্য রকম ও স্বাভাবিক হয়ে আসে। মাকড়সারা নিচু গাছের ডাল বা ঘাসের ওপর জাল বুনলে বুঝতে হবে আবহাওয়া ভাল চলবে। সোয়ালো জাতীয় পতঙ্গ-ভূক পাখীরা ভাল আবহাওয়ার দিনে আকাশের উঁচুতে ওড়ে।

গাছেদের আচরণ :

গাছেরাও আবহাওয়ার খবর বুঝতে পারে। শীতের হাওয়া বরফ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছ যে পাতা ঝরিয়ে দেয় সে খবর আমরা সকলেই জানি।

মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা :

পৃথিবীর জীব জগতে মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। আদিম যুগ থেকে সে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রকৃতিকে নানা ভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। দীর্ঘদিনের তাদের এই অভিজ্ঞতা প্রবাদের রূপ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জন সমাজে অবস্থান করছে। সেগুলি উড়িয়ে দেবার নয়।

যেমন সূর্য যদি লাল আগুনের গোলকের রূপ নিয়ে অস্ত যায় এবং আকাশের মেঘের রঙ যদি নীলচে হয় তবে পরের দিন আবহাওয়া ভাল যাবে এমন অনুমান করা যায়।

যখন ঘাসে প্রচুর শিশির পড়ে, ধোঁয়া যখন আকাশে লম্ব ভাবে ওঠে, সকালে হালকা কুয়াশা হয়, আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়ায় তখন আবহাওয়া ভাল থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সময় গুলিতে ব্যারোমিটারের পারা উর্দ্ধে একই ভাবে থাকে। ওঠা নামা করে না।

রাত্রে বা দিনে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে, বাতাস না বইলে, খোলা আকাশে প্রখর সূর্য থাকলে দিনের তাপ মাত্রা বাড়ে।

এই বিরাট ভু-গোলকে বিভিন্ন দেশগুলির অবস্থান বিভিন্ন অঞ্চলে। আমরা ভূগোলে পড়েছি পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ফলেই ঋতু পরিবর্তন হয়। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান, মেরু ও বিষুব রেখার দূরত্ব অনুসারেও তাপমাত্রার হেরফের হয়। বাতাসের গতি, সমুদ্র স্রোত এ সবও কোনও স্থানের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই কোনও বিশেষ দেশের জলবায়ুর গতি প্রকৃতির সঙ্গে অন্য দেশের জলবায়ুর তফাৎ থাকে। সেই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় শীতের দিনে এদেশে (ক) উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইলে (খ) দক্ষিণ-পূর্ব দিকের হাওয়া বন্ধ থাকলে (গ) সূর্যাস্তের সময় আকাশ পরিষ্কার থাকলে (ঘ) উত্তর আকাশে মেঘের রঙ সামান্য সবুজাভ বলে মনে হলে (ঙ) সূর্য মেঘের আড়ালে থাকলে, তাপমাত্রা কমবে।
আবার যদি এই শীতকালে (ক) রাতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (খ) দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব থেকে বাতাস বইতে থাকে (গ) তাপ প্রবাহ বইতে থাকে তাহলে তাপ মাত্রা বাড়ে।

আবহাওয়া সব সময় একরকম চলে না। কখনও একটানা খারাপ বা ভাল আবহাওয়া চলতে পারে। কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখলে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা বোঝা যায়। খারাপ আবহাওয়া ক্রমশ ভাল হওয়ার লক্ষণ :—

ক) ব্যারোমিটার যন্ত্রের পারা ক্রমশ তাড়াতাড়ি উচ্চতায় বাড়ে।

খ) আকাশের ভরা মেঘ ছেঁড়া মেঘে পরিণত হয়।

গ) মেঘের স্তর নিচে থেকে উর্দ্ধগামী হয়।

ঘ) হাওয়ার গতি পরিবর্ত্তন হয়।

ঙ) টানা তুষার পাতের সময় ফ্লেক পড়া বন্ধ হয়ে গ্লোবিউল পড়তে থাকে।
ভাল আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হওয়ার লক্ষণগুলি হল :—

ক) ব্যারোমিটার যন্ত্রের পারা ক্রমশ তাড়াতাড়ি নিচের দিকে নামে।

খ) মেঘ ঘন হয়। এবং তার রঙ ক্রমশ ছাই রঙ থেকে কালো হতে থাকে।

গ) সূর্যাস্তের রঙ ধূসর আর সূর্যোদয়ের রঙ লাল হয়।

ঘ) পোকামাকড় খাওয়া পাখীরা খুব নিচু আকাশে ওড়ে।

ঙ) আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়।
চ) বাতাসের গতি পরিবর্ত্তন হয়।

ঝড় ও বৃষ্টি ঃ

খারাপ আবাহাওয়ার জন্য এই দুটি বিষয়ের প্রতি ট্রেকার বা পর্বতারোহীদের সতর্ক হওয়া উচিত। কাজের সুবিধার জন্য বিউফোর্ট এর হাওয়ার যে চার্ট তৈরী আছে তা জানা থাকলে ভাল। এটি আর কিছুই নয় হাওয়ার বিভিন্ন গতিবেগ অনুসারে তৈরী একটি তালিকা। হাওয়ার বিভিন্ন গতিবে অনুসারে বিউফোর্ট নম্বর দিয়ে এই তালিকা তৈরী করা হয়েছে।

বিউফোর্ট বাতাসের বেগের তালিকা

বিউফোর্ট নম্বর	বাতাসের বিবরণ	গতিবেগ কিমি/ঘণ্টা	প্রাকৃতিক বিবরণ
০	শান্ত	০—১	স্থির প্রকৃতি। গাছের পাতা নড়ে না। ধোঁয়া সোজা ওঠে।
১	হালকা বাতাস	২—৬	ধোঁয়া খাড়া সিধে না উঠে একটু বেঁকে ওঠে। পর্দা ও বায়ু নির্দেশক যন্ত্র নড়ে না।
২	মৃদু বাতাস	৭—১০	গায়ের চামড়ায় বাতাস অনুভব করা যায়। গাছের পাতা ওড়ে। বায়ু নির্দেশক যন্ত্র নড়ে।
৩	মলয় বাতাস	১২—১৮	গাছের পাতা ও ছোট লতা দোলে। হালকা পতাকা ঝুলে না থেকে উড়তে চেষ্টা করে।
৪	স্বাভাবিক বাতাস	১৯—২৬	ধুলো ওড়ে। ছেঁড়া কাগজ ওড়ে। গাছের ছোট ডাল নড়ে।
৫	শীতল বাতাস	২৭—৩৫	পাতা সমেত গাছের ডাল দোলে। জলে ১/২"—১" ঢেউ ওঠে।
৬	জোরালো বাতাস	৩৬—৪৪	গাছের মোটা ডাল দোলে। টেলিগ্রাফ/টেলিফোন লাইনে সোঁ-সোঁ আওয়াজ হয়। ছাতা খুলতে ও ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়।
৭	হালকা ঝড়	৪৫—৫৪	গোটা গাছ দোলে। ঝড়ের উল্টো দিকে যেতে অসুবিধা হয়।

৮	মাঝারী ঝড়	৫৫—৬৫	গাছের শাখা ভেঙে পড়ে। ঝড়ের উল্টো দিকে যেতে কষ্ট হয়।
৯	তীব্র ঝড়	৬৬—৭৭	ঘর বাড়ির ক্ষতি হয়। চিমনী খুঁটি ভেঙে পড়ে। টালি, টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়।
১০	ঝড়-ঝঞ্ঝা	৭৮—৯০	গাছ উপড়ে পড়ে। মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে।
১১	ঝঞ্ঝা	৯১—১০৪	মারাত্মক ক্ষতি হয়।
১২	ঘূর্ণীবায়ু	১০৫—	সব কিছুই ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে।

মেঘ :

বৃষ্টি, মেঘ, রোদ, বাতাস, এগুলি দিয়েই আমরা সাধারণত আবহাওয়া বিচার করি। তার মধ্যে মেঘ আবহাওয়াকে বুঝতে অনেক সাহায্য করে।

সূর্যের উত্তাপ সমুদ্র ভূপৃষ্ঠের জলকে বাষ্পে পরিণত করে পৃথিবীর উপরে যে বায়ু মণ্ডল আছে তার ওপর দিকে ওঠায়। অধিক উচ্চতার ঠান্ডা বায়ু-মণ্ডলের সংস্পর্শে এসে এই বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা কখনও অতিঠাণ্ডায় বরফের কণায় পরিণত হয়। এই তরল বা কঠিন বরফের কণাগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পৃথিবীতে নেমে আসে। বাতাসে যখন এরা ভাসে তখন এদের আমরা মেঘের আকৃতিতে দেখি। নানা রকমের মেঘ আমরা দেখে থাকি। লাতিন ভাষায় এই সব মেঘের যে সব নাম রাখা হয়েছে সেই নাম গুলি লোকে সাধারণত ব্যবহার করে থাকে।

প্রধান কতকগুলি মেঘের নাম হল :

ক) **সিরাস** (Cirrus)—উঁচু স্তরে পালকের মতো মেঘ। খ) **কিউমিউলাস** (Cumulus)—সাদা বড় বড় ফোলা মেঘ। গ) **ষ্ট্রাটাস** (Stratus)—পাহাড়ের মাথার কাছে জমে থাকা মেঘের পুঞ্জ বা কখনও স্তরে স্তরে জমে থাকা মেঘের স্তর। ঘ) **নিম্বাস** (Nimbus)—যে মেঘের থেকে বৃষ্টি পড়ে।

অনেক সময় একাধিক রকমের মেঘের সমষ্টি থেকে যুক্ত নামের মেঘের নামও হয়। যখন মেঘের স্তর আকাশের নিচু স্তরে থাকে তখন নামের আগে আল্টো (Alto)কথাটি এবং যখন কোনও রকমের মেঘ ছেঁড়া ছেঁড়া হয় তখন তার নামের আগে ফ্রাকটো (Fracto) কথাটি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

আবহাওয়াবিদরা সাধারণত দশ রকমের মেঘের কথা উল্লেখ করেন। এই দশ রকম মেঘেরা পূর্বোক্ত চার রকমের মেঘের সংমিশ্রণ।

১। সিরাস (Cirrus)-(Ci) ২। সিরোষ্ট্রাটাস (Cirrosratus)-(Cs) ৩। আল্টোকিউমিউলাস (Altocumulus)-(Ac) ৪। ষ্ট্রাটো-

কিউমিলউাস (Stratocumulus)-(Sc) ৫। আল্টোষ্ট্রাটাস (Altostratus)-(As) ৬। ষ্ট্রাটাস (Stratus)-(st) ৭। কিউমিউলোনিম্বাস (Cumulonimbus)-(Cb) ৮। কিউমিউলাস (Cumulus)-(Cu) ৯। নিমবোষ্ট্রাটাস (Nimbostratus)-(Ns) ১০। সিরোকিউমিউলাস (Cirrocumulus)-
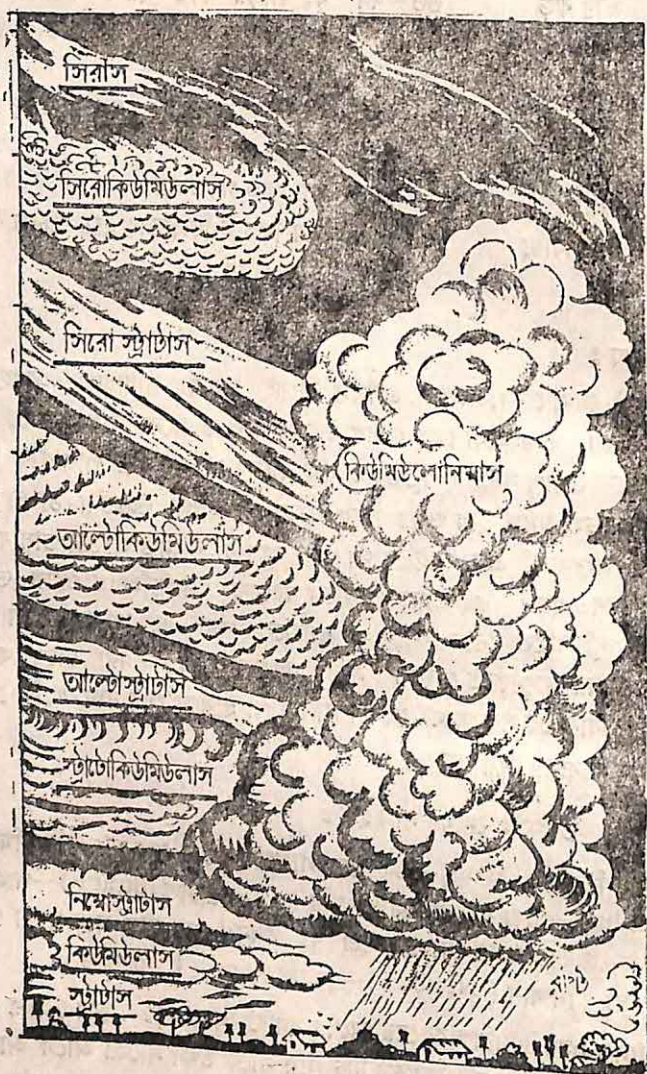
(Ce) ঝড় বা বৃষ্টির আগে ক্রমান্বয়ে আকাশে এই সব মেঘেদের আনাগোনা চলতে থাকে।

প্রথমে সিরাস মেঘেরা আসে। এদের দেখতে সাদা পালকের মতো ! যেন হালকা লম্বা আঁশ। এরা বৃষ্টির দূত। সাধারণত এদের আকাশে দেখা গেলে ২৪ – ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হয়।

এরপর মেঘেরা কম উচ্চতায় নেমে আসে এবং একটা পাতলা আবরণে ক্রমে সূর্যকে ঢেকে ফেলে—ষ্ট্রাটাস মেঘের উৎপত্তি হয়। এরপর মেঘেরা ক্রমশ পৃথিবীর বুকের দিকে নেমে আসে আর সূর্যকে ছাই রঙের আল্টোট্রাটাস মেঘে ঢেকে ফেলে। এরপর ট্রাটাস মেঘের কালো আস্তরণে আকাশ ঢেকে যায়। পাঁচ-ছ ঘণ্টার মধ্যে এই মেঘ নিম্বোট্রাটাস মেঘে পরিণত হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়।

কোনও কোনও মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়ার কথা ঘোষণা করে। নীল আকাশে ভেড়ার পালের মতো সাদা আল্টোকিউমিউলাস মেঘ যখন ধীর গতিতে আকাশে ভেসে বেড়ায়, তখন মোটামুটি স্থিতিশীল আবহাওয়া চলবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

সিরোকিউমিউলাস মেঘ নীল আকাশে কোপান চাষের জমির মতো বা মাছের আঁশের মতো ছোট ছোট হালকা পাঁশুটে সাদা সারি দেওয়া হয়। এই মেঘও সাধারণত ভাল আবহাওয়ার ইংগিত দেয়। তবে আবহাওয়ার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রভাবে এই মেঘের পরিবর্তন হয়ে হঠাৎ বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দিতে পারে।

আকাশের গায়ে ভারী অর্থাৎ বিরাট আকারের কালো পাকানো মেঘের নাম ষ্ট্রাটোকিউমিউলাস।

বিশাল সাদা তুলোর স্তূপের মতো সাদা মেঘগুলি কিউমিউলাস মেঘ। এগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন তার ভিতরটা সব সময় পাক খাচ্ছে, ঘুরছে। এই মেঘগুলি যখন আরও বিশাল হয়ে আকাশ ঢেকে ফেলে তখন এই মেঘকে বলে কিউমিউলোনিম্বাস। যা বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বৃষ্টি নিয়ে মাটিতে নেমে আসে। চৈত্র বৈশাখের কাল বৈশাখী কিউমিউলোনিম্বাস মেঘের সঙ্গে ঈশান কোণের বাতাসের সংমিশ্রণের পরিণতি।

সিরোট্রাটাস মেঘগুলি খুব ছোট ছোট বরফের কণা দিয়ে তৈরী। এই মেঘ হালকা সাদা চাদরের মতো হয়ে যখন চাঁদ বা সূর্যকে ঢেকে ফেলে তখন চাঁদ বা সূর্যের চারদিকে এক উজ্বল গোলাকার আলোর বৃত্ত সৃষ্টি হয়। এই উজ্বল আলোর বৃত্ত বা মালাকে Halo বা বৃত্তমণ্ডল বলে।

অলটোকিউমুলাস মেঘ সূক্ষ্ম জলকণায় তৈরী। এই মেঘ যখন চাঁদ বা সূর্যের সামনে পড়ে তখন রামধনুর মতো রঙিন মালা তৈরী করে। এই

মালার ভিতর দিকের রঙ নীল আর বাইরের দিকটা লাল। এই আলোর মালাকে সূর্য বা চাঁদের শোভা বা Corona বলে।

Halo ও Corona-র তফাৎ এই যে প্রথমটিতে কোনও রঙ-এর অস্তিত্ব নেই কেবল উজ্বল আলোর মালা। দ্বিতীয়টিতে নীল ও লাল রঙের অস্তিত্ব থাকে। Halo ২২° ডিগ্রী থেকে ৪৬° ডিগ্রী ব্যাসার্দ্ধের গোলাকার মালা সৃষ্টি করে। Corona চাঁদ বা সূর্য থেকে মাত্র কয়েক ডিগ্রীর মধ্যে গোলাকার রঙিন আলোর মালা সৃষ্টি করে। নীল আকাশে মেঘেদের এই খেলা দেখা ও তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, পর্যবেক্ষণ করা, দারুণ মজার ব্যাপার। মেঘেরাও যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলে।

অভিজ্ঞ চোখ আর মন, মেঘের দিকে তাকিয়ে আবহাওয়ার পূর্বভাব অনেকখানিই বলে দিতে পারে। কিন্তু তবুও শুধুমাত্র মেঘ দেখে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ না করাই ভাল। সূর্যের অবস্থান, দিনের উত্তাপের তারতম্য, বাতাসের আদ্রতা, বাতাসের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি মেঘের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ করা উচিত। আগেই বলা হয়েছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে কৃত্রিম উপগ্রহ, র‍্যাডার ইত্যাদির সাহায্যে আবহাওয়ার বিষয়ে প্রায় সঠিক পূর্বাভাষ সম্ভব। এই পূর্বাভাষ জানাবার জন্য সরকারী আবহাওয়া দপ্তর থেকে প্রতিদিন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আবহাওয়া সংবাদের বুলেটিন প্রচার করা হয়ে থাকে। উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল, জঙ্গল বা কোষ্টাল ট্রেকিংএর সময় ট্রেকারদের এই আবহাওয়া সংবাদ বুলেটিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

দড়ি আর গেরো
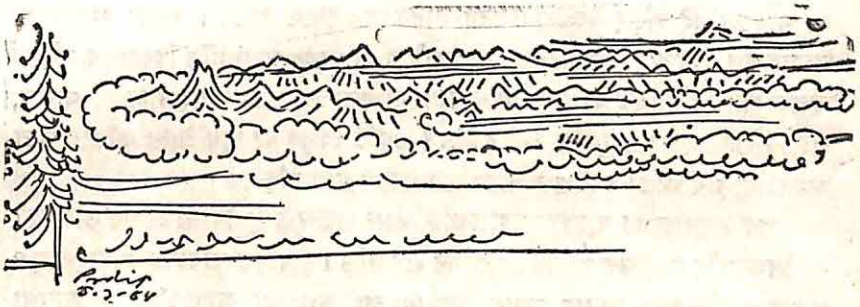
পাহাড়ে চড়তে দড়ি লাগে। কিন্তু যদি মনে করা হয়। পাহাড়ে যাবার সময় পর্বতারোহীরা বাজার থেকে কিছুটা নারকেল বা শনের ছাগল-গরু বাঁধার দড়ি, কিম্বা কুয়োর বালতি বাঁধা দড়ি কিনে নিয়ে যায় তবে ভুল হবে। পাহাড়ে চড়তে দড়ি লাগে। তবে সে দড়ি আলাদা।

আজকাল সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাগুলির উদ্যোগে মাঝে মাঝেই পর্বতারোহণের উপর সেমিনার সহ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। একটু কষ্ট করে সেখানে গেলে পর্বতারোহণের দড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রতি বছর পর্বতারোহণ সংস্থাগুলি শীতকালীন তিন চার দিনের যে সব রক-ক্লাইম্বিং কোর্সের আয়োজন করে সেখানে যোগ দিতে পারলে তো কথাই নেই। দড়ি শুধু চোখে দেখা নয়, দড়ি নিয়ে পাহাড়ে যে কী হয় তার কিছুটা হাতে কলমে শিখেও আসা যাবে।

পর্বতারোহণে যত রকমের সরঞ্জাম আছে তার মধ্যে দড়ি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি আর বিপদের সম্ভাবনায় ভরা এই খেলায় পর্বতারোহীর নিরাপত্তার জন্য দড়ির বিকল্প কিছু নেই।

উপর থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, দুর্গম দুরারোহ পাহাড়ের গা বেয়ে

ক্লাইম্বিং, হিমবাহের উপরের অজস্র ফাটলের (ক্রিভার্স) ধার দিয়ে পথ চলা বা লুজ বরফে ঢাকা চোরা ফাটলে তলিয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচতে দড়ি-ছাড়া গতি নেই। আরোহণ, অবরোহণ, উদ্ধারকার্য, পাহাড়ী নদী বা নালাগুলি পারাপার, পর্বতারোহণের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামগুলি দুরারোহ জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য দড়িই এক মাত্র অবলম্বন। তাই পর্বতারোহণে দড়ির অপর নাম "জীবন সূত্র"।

কিন্তু স্মরণ থাকতে পারে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে নতুন ও অনভিজ্ঞ ট্রেকাররা ট্রেকিং এর সময় সঙ্গে দড়ি নেবেনা। প্রশ্ন উঠতে পারে ট্রেকারদের বিপদে ফেলার জন্যই কি কথাটা বলা হয়েছে? না। আসলে দড়ির সুষ্ঠু ব্যবহার অর্থাৎ পর্বতারোহণের ভাষায় যাকে বলা হয় দড়ি পরিচালনা তা জানা না থাকলে এই দড়িই উল্টে বিপদের কারণ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ আরোহণ, অবরোহণ, বিপদে আত্মরক্ষা বা সঙ্গীকে উদ্ধারের সময় যদি ঠিকভাবে দড়িকে কাজে লাগান না হয় বা ভুল ভাবে ব্যবহার করা হয় তবে সাহায্য দূরে থাকুক, এই দড়িই পর্বতারোহীর ক্ষেত্রে নতুন একটি বিপদ বা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া অথবা মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পর্বতারোহণের যুগের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বহু বিখ্যাত পর্বতারোহী বা শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক পরিণতির কারণ এই দড়ি। দড়ির ব্যবহার জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দড়ি পরিচালনার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভুল বা অসতর্কতাতে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তাই শুধু মাত্র বইপড়া বিদ্যে নিয়ে দড়ির ব্যবহার না করতে যাওয়াই ভাল। একটা কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন এই যে, বই পড়ে পর্বতারোহণ শেখা যায় না। ও বস্তু হাতে কলমে শিখতে হয়।

দড়ির ব্যবহার পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের সময় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শেখান হয়ে থাকে। বিষয়টি জটিল হওয়ার জন্য বার বার অভ্যাসের মাধ্যমে কলাকৌশলগুলি আয়ত্ব করতে হয়। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্ত্তিতা, আর আত্মবিশ্বাস ছাড়া সঠিক ভাবে দড়ি পরিচালনা অসম্ভব। খাম খেয়ালিপনা, গোঁয়ার্তুমি, বা ভুল ভাবে দড়ি ব্যবহার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই হঠকারীতার খেসারত দিতে হবে এবং তা এক বা একাধিক জীবনের বিনিময়ে। কাজেই দড়ির ব্যবহার যদি যথাযথ ভাবে জানা না থাকে তবে অনভিজ্ঞ বা নতুন ট্রেকারদের তা সঙ্গে না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দড়ির ব্যবহার ঃ

সাধারণত দড়ি তিন রকমের দেখা যায়। (১) আরোহণ দড়ি (Climbing rope) (২) অবরোহণ দড়ি (Rappelling rope) (৩) টুকরো দড়ি (Loop)।

আরোহণ দড়ি (Climbing rope) ঃ পর্বতারোহণের সময় প্রয়োজনের

তাগিদে পর্বতারোহীদের নিজেদের এক জনের সঙ্গে অপর জনকে বেঁধে অনেক সময় চলতে হয়। বিশেষ করে ক্লাইম্বিং বা হিমবাহের ওপর দিয়ে চলার সময়। এই জন্যে একে সংযোজক দড়ি বা দলীয় দড়ি বলা হয়। আরোহী পড়ে গেলে দড়ি যাতে ছিড়ে না যায় সেই কারণে এই দড়িগুলি শক্তিশালী হয়ে থাকে। এগুলির ছিঁড়ে যাবার শক্তিসীমা সাধারণত চার হাজার পাউণ্ডের বেশি হয়। এবং পতন-জনিত ধাক্কা সামলানোর জন্য ২০%—৩০% স্থিতিস্থাপক হয়। দড়ির বেড় ১১ মিমি। কতটা দৈর্ঘ্যের এই দড়ি হবে তা ব্যবহারকারীদের সংখ্যার ওপর এবং সর্বনিম্ন স্থান থেকে কতখানি উঠতে হবে তার দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণ আরোহণে দুই আরোহীর মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য ৬০—৬৫ ফুট থাকে। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য কোন কোনও সময়ে ব্যবহার করা হয়। ক্লাইম্বিং-এর সময় কম-বেশি ১৩০ ফুট দড়ির প্রয়োজন হতে পারে।

অবরোহণ দড়ি (Rappling rope) ঃ এই দড়ির সাহায্যে লাফাতে লাফাতে উপর থেকে নিচুতে নামা হয়। আপাত সরু এবং ওজনে হাল্কা এই দড়ির বেড় ৭ মিমি এবং ছিঁড়ে যাবার শক্তিসীমা ৪০০০ পাউণ্ড। কতটা উঁচু থেকে নামা হবে বা পরিকল্পনা মাফিক এর দৈর্ঘ্য হয়। তবে সাধারণত ১০০—২৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের এই দড়ি দেখা যায়।

অনেক সময় নিরুপায় হয়ে অবরোহণ দড়িকে আরোহণের কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে সেই ক্ষেত্রে দড়িকে এক ভাঁজ করে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। এবং মাঝামাঝি জায়গাকে সুনির্দিষ্টভাবে কোনও রকম রঙ বা রঙিন সুতো দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

টুকরো দড়ি (Loop) ঃ এগুলির দৈর্ঘ্য মাত্র ১০-১৫ ফুটের মতো হয়। অবরোহণের সময় দড়ির ফাঁস বা নোঙরের সাহায্য নিতে এই দড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সাধারণত এগুলির ৬ মিমি. ব্যাস এবং ৭০০ পাউণ্ড শক্তি সীমা হয়ে থাকে।

দড়ির প্রকৃতি বা গঠন ঃ Silk, Lutzner, Hawser-laid, Karn-mantle Energy rope, Everdry, Dryline এই রকম নানা ধরনের দড়ির প্রচলন আছে। কিন্তু বর্তমানে এদেশে আরোহণ অবরোহণের জন্য Hawser-laid [cabled] দড়ি ও Braided বা kernmantle [core & seath] দড়িই বেশি প্রচলিত। খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

Hawser Laid [cabled] দড়ি ঃ নাইলনের সূক্ষ্ম সুতো পাক দিয়ে প্রাথমিক ভাবে যে মোটা সুতো তৈরী হয় তার তিনটি একত্রিত করে পুনরায় পাক দিয়ে আরোহণ বা অবরোহণের এই দড়ি তৈরী হয়ে থাকে। নমনীয়, টেঁকসই, অসীম স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা সম্পন্ন এই দড়ি, সাধারণ আরোহণ বা

অবহরোহণের সময় ব্যবহারে অত্যন্ত সুবিধাজনক। আরোহীরপক্ষে এই দড়ি দৃঢ়ভাবে হাতের মুঠোয় ধরা সহজ বলে অতিরিক্ত সুবিধার সৃষ্টি করে। যদিও র‍্যাপলিং বা অবরোহণের সময় ক্যারাবিনার বা আংটা ও ডিসেনডার বা অবহরোণ কাঁটার সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয় তবুও এটি নির্ভর-যোগ্য।

সরু মোটা বেশ কয়েক রকমের এই দড়ি পাওয়া যায় এবং সেগুলির ছিঁড়ে যাবার শক্তি সীমাও বিভিন্ন রকম।

Braided বা **Kernmantle [Core & seath] দড়ি ঃ** এই দড়িতে বিনুনি করা একটি খোলস বা আবরণের মধ্যে দড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে কোনও রকম পাক না খাওয়া ও জোড় বিহীন এক গোছা নাইলন সুতো এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই দড়ি বর্ত্তমানে খুবই প্রচলিত। এই দড়ির ক্ষমতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে এবং টেঁকসই। মসৃণতার জন্য ক্যারাবিনার প্রভৃতির মধ্যে সহজে চলাচল করতে পারে এবং সহজে জট পাকিয়ে যায় না। জিগ্ জ্যাগ বা আঁকা বাঁকা পথে আরোহণের ক্ষেত্রে এই দড়ি সহজে ব্যবহার করা চলে। সরু মোটা বিভিন্ন রকমের এই দড়ি পাওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে ১১ মিমি, ৯ মিমি, ও ৭ মিমি ব্যাসের এই দড়িগুলির ছিঁড়বার শক্তিসীমা যথাক্রমে ১৯৫৪.৫ কিগ্রা, ১৪৪৫.৫ কিগ্রা ও ৯৩৫.৫ কিগ্রা।

দড়ি সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ঃ যে দড়ি পাহাড়ে পর্বতারোহীদের প্রাণ বাঁচায় তা যদি অক্ষত বা সম্পূর্ণ ভাবে ত্রুটি মুক্ত না থাকে তবে তার মূল্যে কিছুই নেই। তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে দড়ির প্রতিটি ইঞ্চি যেন অক্ষত থাকে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অনাবশ্যক কোনও অসঙ্গত টান যেন দড়ির ওপর কখনও না পড়ে। ব্যবহার করার আগে এবং ব্যবহার কালীনও দড়িকে বার বার পরীক্ষা করা উচিত। সাধারণত ব্যবহারকালীন দড়ির উপর পাথর পড়লে, ধারাল পাথরের ঘষা লেগে এবং লোহার কাঁটা লাগান জুতো পরে, এমনকি সাধারণভাবে দড়িতে পা দিয়ে দাঁড়ালেও দড়ির গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। দড়ির শক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে বা ক্ষতিগ্রস্থ বলে মনে হলে তাকে আর ব্যবহার করা উচিত নয়।

দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হলে নাইলনের দড়িতে অনেক সময় আঁশ উঠতে দেখা যায়। অনেক সময় দড়ির গা ক্ষয়ে যেতেও দেখা দেয়। ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ার আগেই এসব দড়ি ত্যাগ করা উচিত।

অধিক উত্তাপ বা যে কোনও ধরণের আগুনের কাছে দড়ি রাখা উচিত নয়। আরোহণ দড়িকে কোন অবস্থাতেই অন্য কোনও কাজে লাগান উচিত নয়। অর্থাৎ বাসের ছাদে মাল বাঁধা, তাঁবু খাটানোর জন্য বা মালপত্র বাঁধাছাঁদার

কাজে লাগান উচিত নয়।

দড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখার সময় দেখতে হবে বৃত্তগুলি যেন একই মাপের হয়। ছোট বড় মাপের হলে ব্যবহারের সময় এগুলি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এমন কি এলোমেলো ভাবে গোছান দড়ি সাধারণ পরিস্থিতিতেও বয়ে নিয়ে যাবার সময় পাথর, গাছের ডাল, ঝোপে ঝাড়ে আটকে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। এমনিতেও এখানে ওখানে ঘসা লেগে দড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। দড়ির কুণ্ডলীগুলির ব্যাস ২০—২৫ ইঞ্চির মতো হলেই ভাল।

দড়ি পরিষ্কার করার সময়, অর্থাৎ দড়ির গা থেকে কাদা, বালি বা পাথরের কুচি ইত্যাদি পরিষ্কার করার সময় ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা উচিত। এবং দড়ি কুণ্ডলী পাকানোর আগে তা শুকিয়ে নিতে হবে। এবং কখনই উত্তাপ বা উজ্জ্বল আলোয় শুকান উচিত নয়।

ট্রেকিং বা পর্বতারোহণ যখন থাকে না সে সময় দড়ি গুদামজাত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দড়িগুলি যেন কখনও রাসায়নিক পদার্থ, মোটরগাড়ির ব্যাটারী বা আগুনের কাছাকাছি না থাকে। সূর্যের সোজাসুজি আলো থাকবে না, অথচ প্রচুর বাতাস বয় এমন জায়গায় দড়ি রাখা চলে। উই ইঁদুর বা পোকা-মাকড়ের সংস্পর্শ থেকে দড়িকে দূরে রাখতে হবে।

● গেরো (Knot)

চলতি কথায় ঝামেলা বা বিপদে পড়লে লোকে বলে, গেরো। কিন্তু পাহাড়ে যারা চড়ে, গেরো কথার অর্থ তাদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। গেরো সেখানে পাহাড়ে বিপদ আপদে উদ্ধারের ক্ষেত্রে একমাত্র সহায়। আগেই বলা হয়েছে দড়ি পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামটি একেবারেই অর্থহীন, যদি না গেরো বা গ্রন্থি (Knot) বাঁধতে বা খুলতে জানা না থাকে। পর্বতারোহণে বেশ কয়েক রকমের নটের প্রয়োজন হয়। দড়িকে সম্পূর্ণ ভাবে এবং সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগাতে গেলে প্রতিটি পর্বতারোহীর নট বা গ্রন্থি বাঁধা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিখতে হবে।

নটগুলি পর্বতারোহণের বিভিন্ন পর্যায়ে বা ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনে নানা রকমভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বেঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ নট অনাবশ্যক সময় নষ্ট করে বা তা নিজেই দুর্ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ পর্বতরোহীও ভুল বা আলগা নট কাজে লাগিয়ে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর মতো ব্যাপার ঘটিয়েছেন এমন বহু উদাহরণ আছে।

নটগন্নলি আপাত দৃষ্টিতে খন্নবই সরল বলে মনে হলেও মাত্র কিছন্নদিন এগন্নলি বাঁধা অভ্যাস না করলেই নতুন শিক্ষার্থীরা তা সহজেই ভুলে যায়। তাই, বার বার অনন্নশীলন দরকার। কোন নট কোথায় বাঁধতে হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিন্ত হতে হবে। ব্যবহারের আগে নটগন্নলি ঠিক মতো বাঁধা হয়েছে কিনা তা বার বার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। এগন্নলি ঢিলে হওয়া বা খন্নলে যাওয়া খন্নবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ বিষয়ে সতর্ক না হলেই বিপদ ঘটে যাবে। এই কারণে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা চলা বা আরোহণ থামিয়ে নটগন্নলি বার বার পরীক্ষা করে নেয়। মনে রাখতে হবে পর্বতারোহণে অশিক্ষিত, অসতর্ক অমনোযোগী, অদক্ষ্য ও অহংকারীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দন্নর্ঘটনার শিকার হয়। পাহাড় কখনও ভুলকে ক্ষমা করে না।

দাঁড় পরিচালনার সময় যে সব নট কাজে লাগে তার কয়েকটির ছবি দেওয়া হল। তবে ছবি দেখে বা বই পড়ে এগন্নলি শেখা যায় না। কোথায়, কখন এবং কেন কোন কোন নট ব্যবহার করা হবে তা হাতে কলমে শিক্ষা নেওয়া
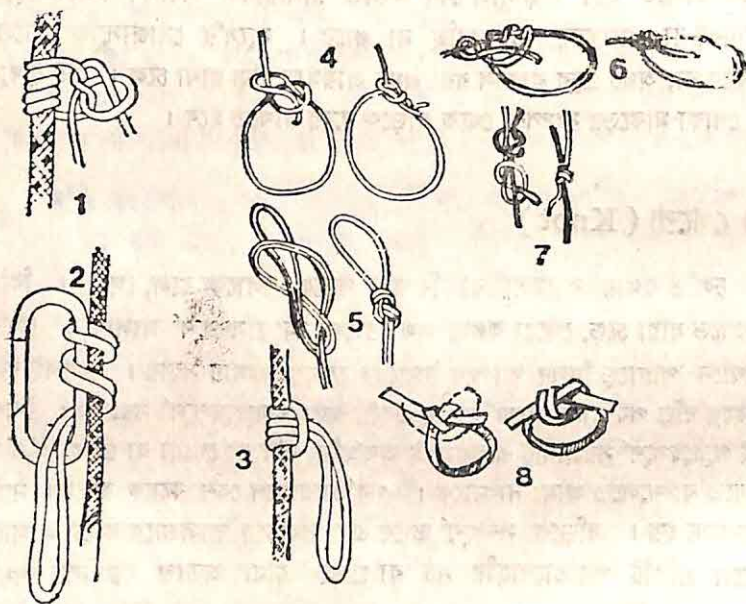
1) Penberthy—ক্রিভার্স থেকে উদ্ধারের জন্য 2) Bachmnn—রেসকিউএর জন্যে, 3) Prusik—রেসকিউ, 4) Bowline—বাঁধার জন্যে 5) Figure of Eight—বাঁধার জন্যে, 6) Turbuck—বাঁধার জন্যে 7) Fishermans—দন্নটি দড়িকে বিশেষতঃ শ্লিং জোড়ার কাজে 8) Tape—দন্নটি টেপকে বাঁধার কাজে।

এবং সেগুলির বার বার অনুশীলন প্রয়োজন। এর জন্য স্থানীয় ভাবে রক-ক্লাইম্বিং কোর্স করা HMI বা IMF ইত্যাদির অধীনে যে সব বেসিক বা এডভান্স কোর্সের আয়োজন করা হয় সেখানে শিক্ষা নিতে হবে।

নট বা গ্রন্থি সম্পর্কে যা আলোচনা হল তা অত্যন্ত সামান্য। পর্বতারোহীরা প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে দড়ি পরিচালনার সময় যে নটগুলি প্রায় সময়েই ব্যবহার করে থাকে সে সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। এ সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা বলা যায় তা হল যত কম সংখ্যক বা সরল (Simple) নট ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। বেশি সংখ্যক নট অরিরিক্ত নিরাপত্তা যোগাবে এ ধারণা ভুল। যাই হোক এগুলির ব্যবহারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

১। প্রিলিমিন্যারী নট

এটি অবশ্যই Thumb বা Half Hitch knot দড়ির প্রান্তগুলিতে এই knot বাঁধা হয়ে থাকে। খুবই সহজে এই গ্রন্থি বাঁধা বা খোলা যায়।

২। ক্লাইম্বিং নট

কোমরবন্ধের বদলে যখন সরাসরি ক্লাইম্বিংরোপকে ব্যবহার করা হয় তখন সাধারণ ভাবে চার রকমের নট ব্যবহার হতে পারে :

(ক) গাইডস্ নট (Guide's Knot) সাধারণ রোপক্লাইম্বিং-এ এটির ব্যবহার খুব বেশি।
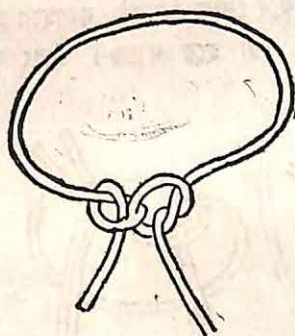
Guide's Knot

(খ) বোলাইন (Bowline)

খুবই নির্ভর যোগ্য সহজে বাঁধা ও খোলা যায়। এগুলি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে (ছবি অনুযায়ী)। তবে সব সময়েই এই দড়ির প্রান্তে Thumb knot লাগান দরকার এবং এটি লাগান না হলে যে কোনও মুহূর্তে বিপত্তির

সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে।
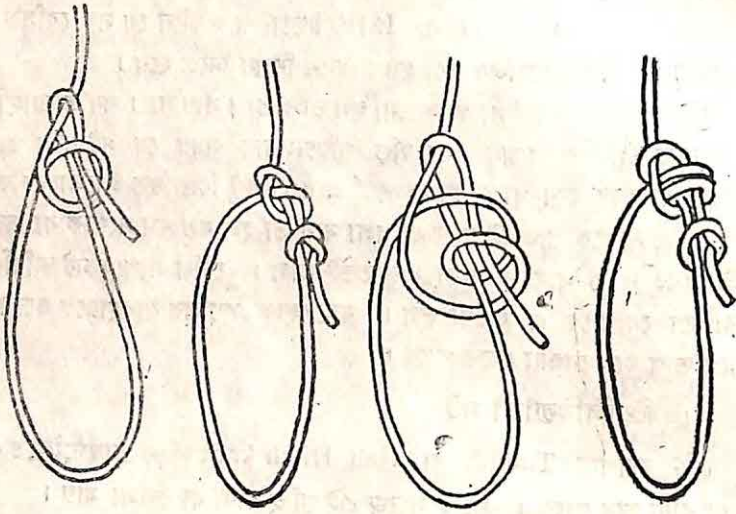
Single Bowline — Single Bowline with Stop-Knot — Double Bowline — Double Bowline with Stop-Knot

(গ) কয়েল বোলাইন (Coil Bowline)

ক্লাইম্বিংরোপের প্রান্তে কোমরে পাঁচ-ছ বার বেড় দিয়ে সেখানে Bowline Knot বাধা হলে তাকে Coil Bowline বলে। প্রান্তে Thumb knot এ ক্ষেত্রেও দিতে হবে। খুব বেশি এই নট ব্যবহার হয় বলে ক্লাইম্বিং রোপের দৈর্ঘ্যও আজকাল বেশি করা হয়ে থাকে। এবং দুজন আরোহীর জন্য
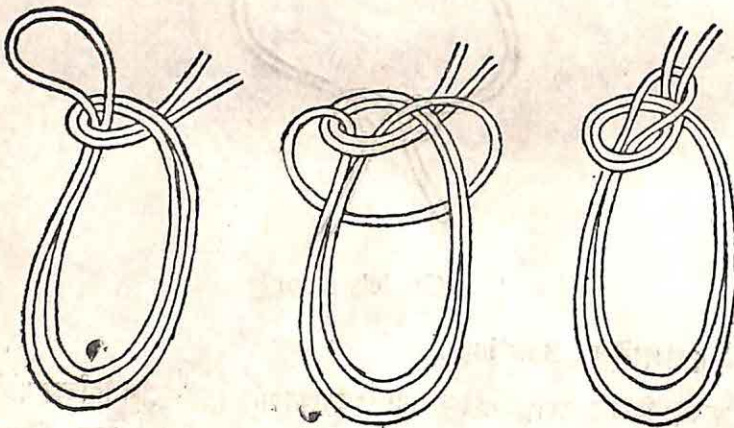
Chair knot/Bowline on the Bight

অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য বাড়ান হয়ে থাকে।

(ঘ) Bowline on the Bight বা চেয়ার নট।

আর্টিফিসিয়াল ক্লাইম্বিং, ক্রিভার্সে ভরা হিমবাহ, তুষার স্তূপ বা উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া আরোহীকে উদ্ধারের জন্য এই গ্রন্থি বাঁধা হয়। সহজ, কিন্তু খুলতে সময় লাগে।

৩। কোমর বন্ধ ও ক্যারাবিনার (Carabinar) এর সাহায্যে রোপ ক্লাইম্বিং-এর নট।

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা সাধারণত দু-রকমের গ্রন্থি কাজে লাগায়।

(ক) Over hand knot

এই গ্রন্থি বাঁধা সহজ কিন্তু জল বা নরম বরফে ভিজে গেলে খোলা কষ্টকর। উপযোগী এবং শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হওয়া উচিত।

Overhand knot　　Figure-eight knot

(খ) Figure of eight knot

ইংরাজী ৮ এর মতো দেখতে হওয়ার জন্যই নটটির এই নাম। অত্যন্ত মজবুত ও সহজে খোলা ও বাঁধা যায়। এমন কি ভিজে অবস্থাতেও খোলা সহজ।

ক্লাইম্বিং রোপের সঙ্গে সরাসরি অথবা কোমর বন্ধ এবং ক্যারাবিনারের সাহায্যে রোপের এণ্ড বা মিড্‌লম্যান তাদের নিজেদের বাঁধতে, কোমরবন্ধের
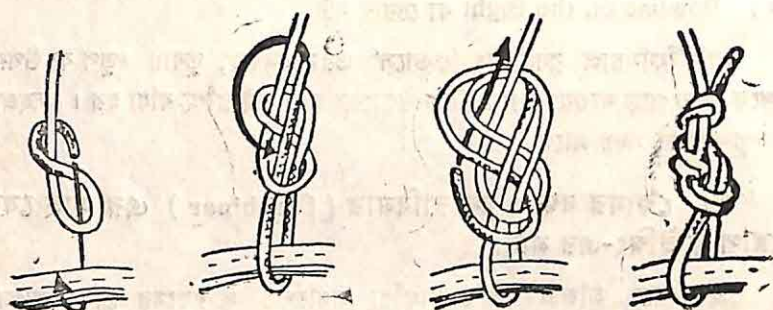
Tying in to Harness. Figure-8 for endman.
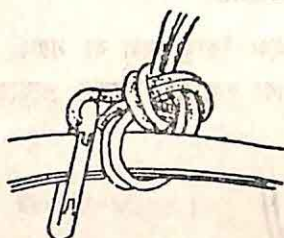
Bowline on doubled rope with carabinar jam for middleman.

সঙ্গে মূল ক্লাইম্বিং রোপের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে, থামার জন্য, কোমর ফাঁসের মধ্যে দিয়ে নোঙর (Anchor) করার জন্য, বরফে আরোহণের সময়, আইস এ্যাক্স দিয়ে অবরোধ করার সময় এই নট ব্যবহার করা হয়।

৪। সংযোগ গ্রন্থি (একই ব্যাস বিশিষ্ট দড়ির ক্ষেত্রে)

ক্লাইম্বিং এর সময় একটি মাত্র দাড়িতেই যে কাজ চলে যাবে এমন কথা নয়। দড়ির সঙ্গে দড়ি যোগ দিতেই হয়। এর জন্য বিশেষ কতকগুলি নট প্রয়োজন হয়।

(ক) Fisherman knot/Double Fisherman knot
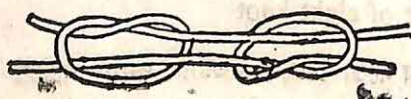
Fisherman's knot

নির্ভর যোগ্য, সহজে বাঁধা যায় যায়। টান পড়লে এই নট ক্রমেই শক্ত হয়। আবার ইচ্ছে করলে আলগাও করা যেতে পারে।
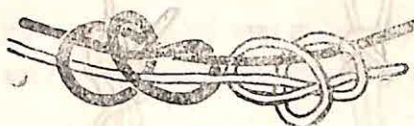
Double Fisherman Knot

(খ) Figure of Eight knot

Joining of ropes double Gigure 8 with over hand

নিরাপত্তার দিক দিয়ে এই নট সম্পর্কে প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই নটগুলি বড় আকার হয়ে থাকে।

(গ) Reef knot

Wrong
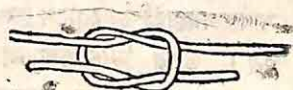
Right

দাঁড়ি যখন বরফ বা পাথরের গা বেয়ে ঝোলে তখন এই নট ব্যবহার করা হয়। সতর্কতার সঙ্গে এই নট ব্যবহার করা উচিত কারণ দাঁড়ির টান না থাকলে এই নট ঢিলে হয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

(ঘ) Overhand knot

এই নটও সংযুক্তির জন্য ব্যবহার হয়।

৫। সংযোগ গ্রন্থি (বিভিন্ন ব্যাসের দাঁড়ির ক্ষেত্রে)

দাঁড়িগুলি সরু মোটা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। সেক্ষেত্রে জোড় দেওয়ার ক্ষেত্রে Sheet Bend Knot-ই ব্যবহার করা হয়। এগুলি বাঁধা ও খোলা সহজ।

Single sheet bend Double sheet bend

৬। **Self-Tightning knot**

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই নট গুলি দুর্ঘটনা রোধের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত পাঁচ রকমের এই জাতীয় নট আছে।

(ক) Prusik বা Friction knot

অতান্ত সহজ সরল এই গ্রন্থি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অত্যন্ত উপযোগী। সাধারণ ক্লাইম্বিং রোপে অপর একটি সরু দড়ি ব্যবহার করে তাতে নট লাগন হয়। উপর নিচে চলাচল করানো সম্ভব। হিমবাহ থেকে উদ্ধার, পতন, দুরারোহ আরোহণ, সরাসরি সহযোগিতা, ঝুঁকি পূর্ণ আরোহণ বা ট্রাভার্স ইত্যাদি নানা পরিস্থিতিতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে।
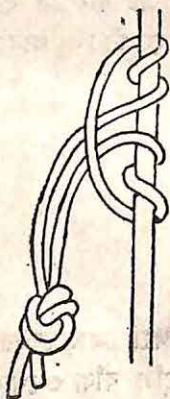
Bunk knot Alpen verein knot

(খ) Alpenverein knot

এই নট খোলা ও লাগান সহজ নয় বলে ব্যবহার কম।

(গ) Machard knot

মূল ক্লাইম্বিং রোপের সঙ্গে ৪/৫ ফুট লম্বা নাইলন দাঁড় দিয়ে এই গ্রন্থি বাঁধা হয়ে থাকে। এগুলি লাগানো ও খোলা সহজ হলেও দাঁড় ভিজে থাকলে নিরাপদ নয়।

Machard Self Tightning with snap link

(ঘ) Self-Tightning knot on snap link

এই নট লাগান ও খোলা সহজ হলেও সময় সাপেক্ষ। দাঁড় ভিজে হলে বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

(ঙ) Clove Hitch knot
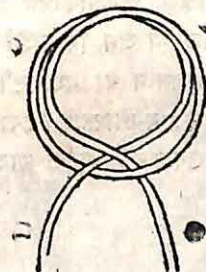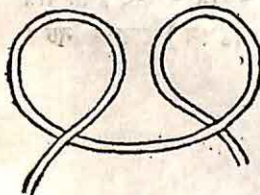
Clove Hitch

ক্যারাবিনারের সাহায্যে আরোহণ, চেস্ট হারনেস বাঁধার জন্য, সেল্ফ

বিলে (Self Belay) ফাঁস বা নিজেকে anchore করতে, উদ্ধার কার্যে। পর্বতারোহণের ছোটখাট সরঞ্জামগুলি তুলতে, এবং স্থায়ী ভাবে টাঙানো দাড়িকে হাতল হিসেবে ব্যবহার করতে এর প্রয়োজন অসীম। অত্যন্ত সহজে এই গ্রন্থি খোলা ও বাঁধা যায়।

৭। অবরোধক (Belay) গ্রন্থি

সঙ্গীকে অবরোধ করার সময় anchore এর সঙ্গে নিজেকে বাধতে সাধারণত Half Hitch, Overhand knot, Figure of Eight knot ও Turbuck knot ব্যবহার করা হয়।

৮। নিবৃত্ত গ্রন্থি

কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাড়িকে আটকে রাখার জন্য অথবা গ্রন্থি খুলে দাড়ির প্রান্ত বের হয়ে না আসতে দেবার জন্য সাধারণত Thumb knot, Over Hand knot, Figure of Eight knot গুলি ব্যবহার করা হর।

৯। বিভিন্ন অন্য গ্রন্থি

উপরে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নানা রকম গ্রন্থির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনে বিভিন্ন রকম গ্রন্থি ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন, Timber Hitch knot, Double Fisherman knot, Butterfly knot ইত্যাদি।

পর্বতারোহণের সময় দাড়ি ও তার জন্য সাধারণত যে সব গ্রন্থি (Knot) মোটামুটি ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে নিচের তালিকা থেকে ধারণা করা যেতে পারে।

যখন একই দাড়িতে তিন জন আরোহী থাকেন। তখন দুজন এণ্ডম্যান বা প্রান্তিক আরোহীদ্বয়—কয়েলবোলাইন / গাইডনট / ফিসারম্যান / বোলাইন / বোলাইন অন দি বাইট (ডবল বা ট্রিপল), চেয়ার নট বা ডবল নট। এবং মিড্‌লম্যান বা মধ্যবর্তী আরোহী—ফিগার অব এইট / ওভার হ্যান্ড / ফিশার ম্যান / বাটারফ্লাই / বোলাইন অন দি বাইট (ডবল বা ট্রিপল) চেয়ার নট / বা ডবল নট প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন।
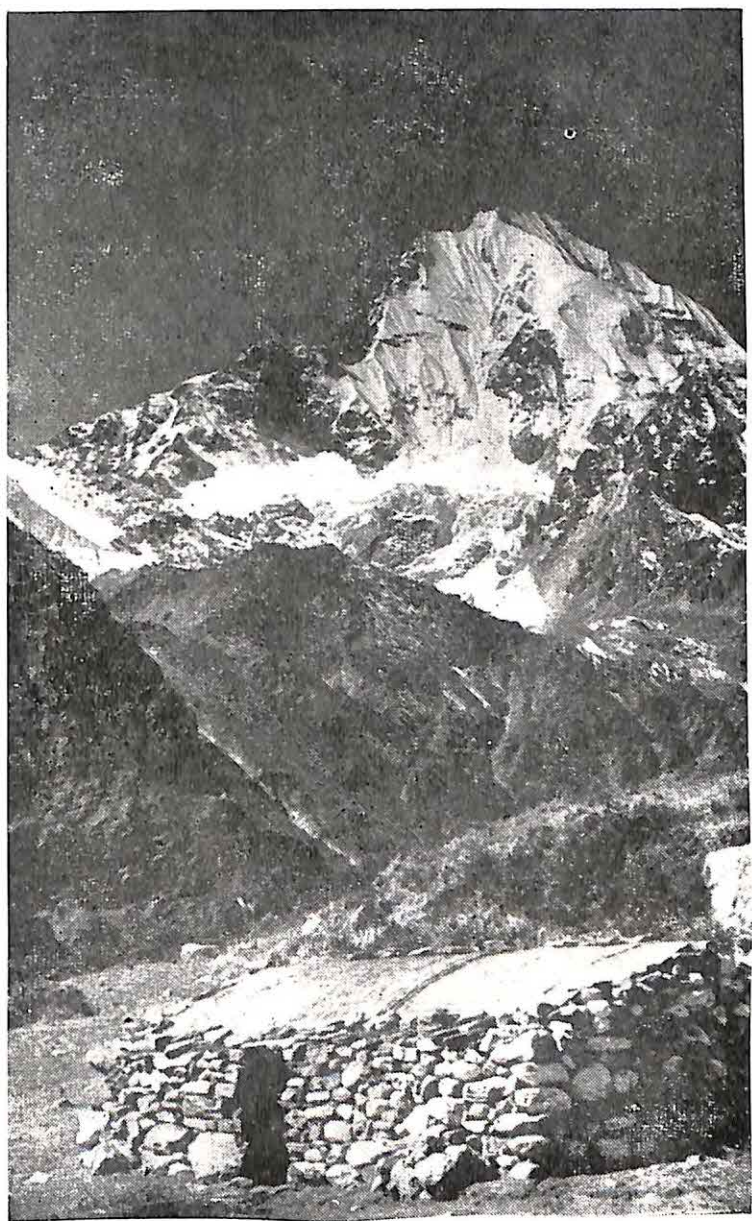
হিমালয় [নেপাল/ল্যাংট্যাং শৃঙ্গ]

তুষারের অলৌকিক জগৎ (কুমায়ুঁ)
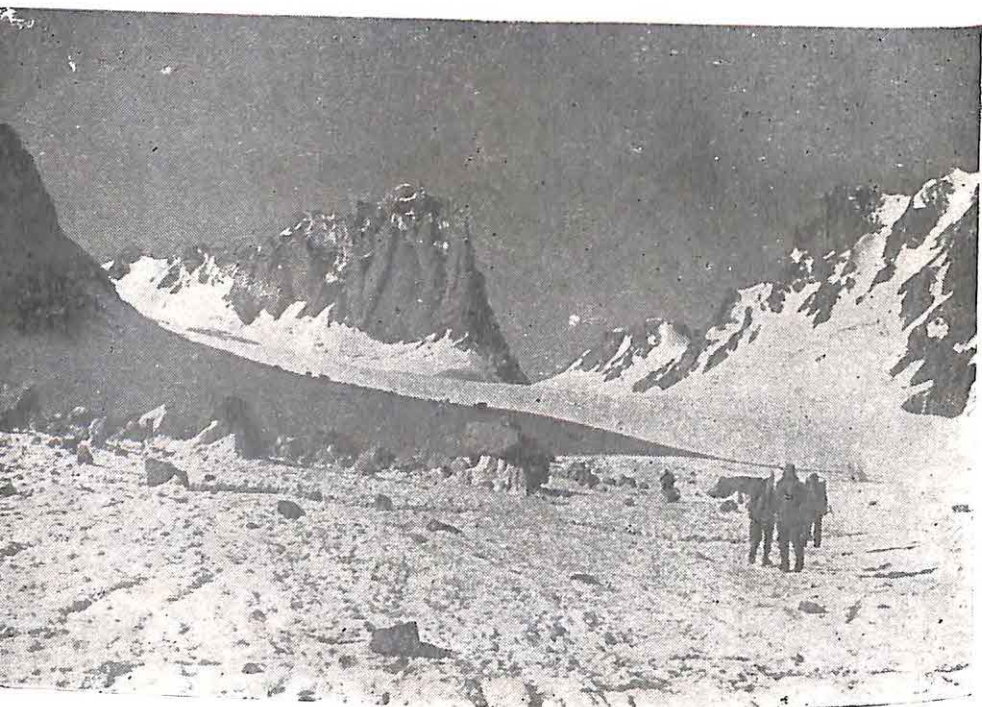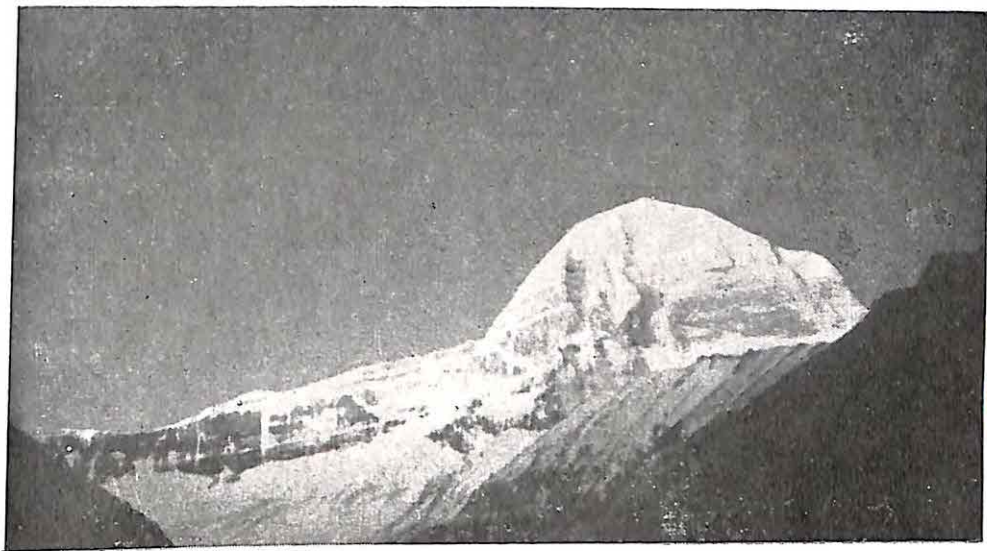
কৈলাস

মানস সরোবর
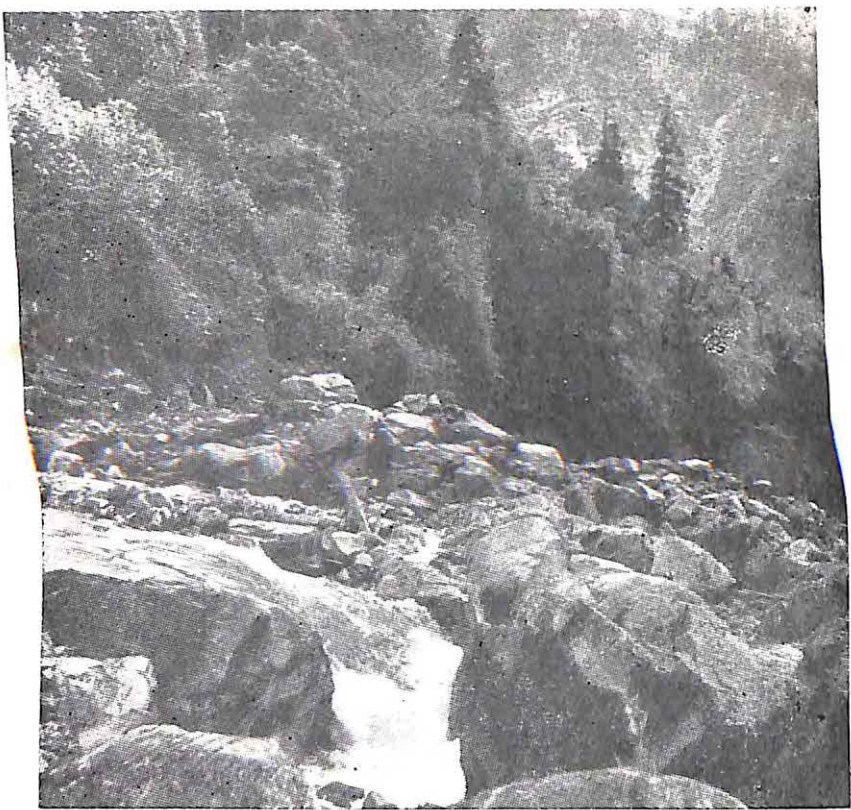
পথের সৌন্দর্য (কুমায়ুঁ)
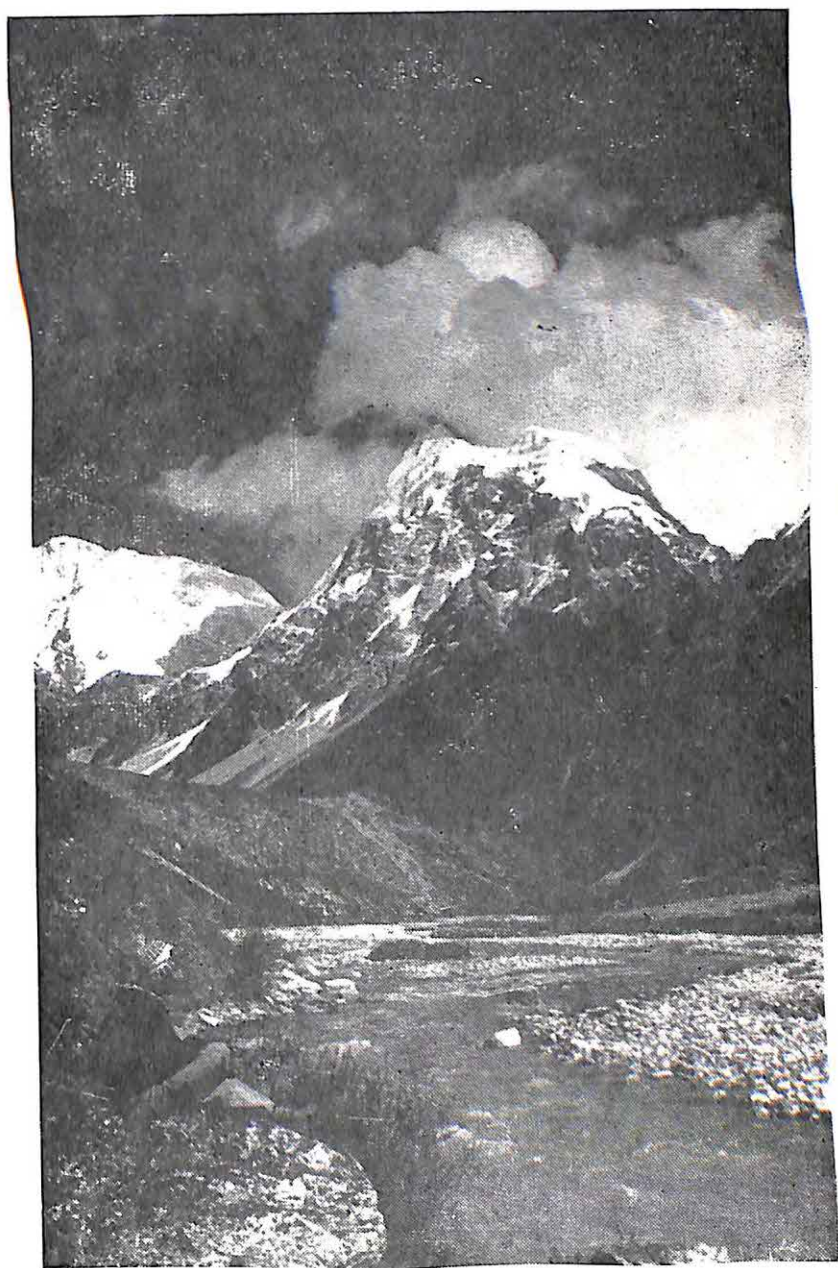
পাহাড়ী নদী [নেপাল/ল্যাংট্যাং ভ্যালী]

পাহাড়ী মানুষ

তুষারের রাজ্যে পর্বতারোহীরা

গেঞ্জেলা পাসের পথে
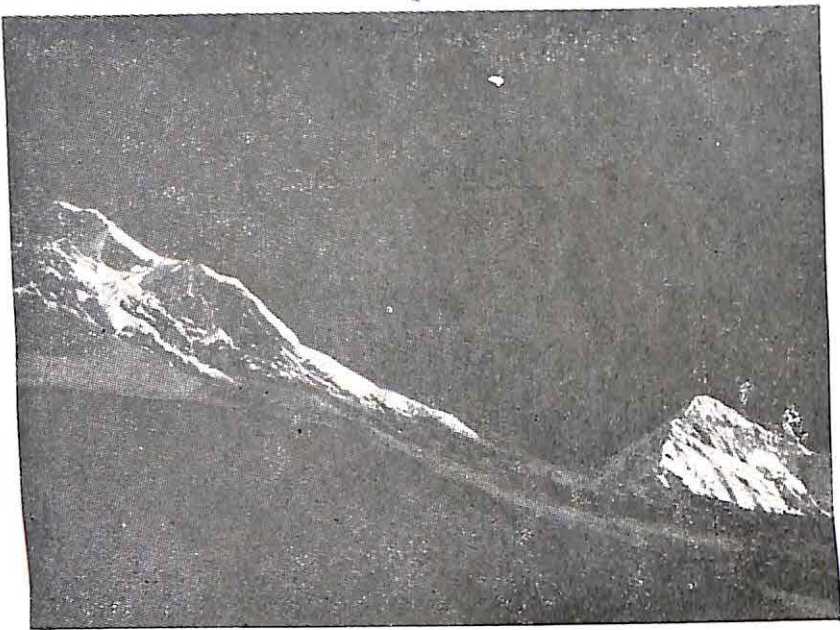
নন্দাখাত-নন্দাকোট শৃঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়

ক্যাম্পিং

রক ক্লাইম্বিং

পাহাড়ের বিপদ আপদ

ফটোগ্রাফী

হিমালয়ের ফুল ও পশুপাখীর বিবরণ

পর্বতারোহণের পরিভাষা

এবং

অসংখ্য ট্রেকিং রুটের ম্যাপ সহ বিবরণ

উভয় খণ্ডেই ওয়ান্ট আন্সওয়ার্থের রকক্লাইম্বিং, এ্যালান ব্লাক'শর মাউন্টেনিয়ারিং, রয়াল রবিন্সের বেসিক এণ্ড এডভান্স রক ক্রাফ্ট, জিওফ্রীসট্লের আর্টিফিশিয়াল এইডস্ ইন মাউন্টেনিয়ারিং, পেগী ফার্বরের মাউন্টেনিয়ারিং ও কল্যাণ চক্রবর্তী, অমিয় মুখোপাধ্যায় এবং প্রাণেশ চক্রবর্তীর পর্বতারোহণের উপর বাংলা বইগুলি এবং বেডেন পাউল ও উমা খাঁর স্কাউট বইটি ছাড়াও বেশ কিছু দেশী বিদেশী বই ও IMF ও HMI-এর পত্রপত্রিকা ও পর্বতারোহণ সংস্থার মুখপত্র গুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।